নয়নপুরের মাটি

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৫৭

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা মাত্র

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরির পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাগরকে—

'নয়নপুরের মাটি'তে একটি লাইন আছে, 'আহা! বাঁধা বীণার তারে বেসুর কী গভীর!' সেই সুর বাঁধারই প্রথম উন্মাদনা 'নয়নপুরের মাটি', আমার প্রথম লেখা উপন্যাস।

আমার লেখা 'উত্তরঙ্গ'-এর বহুপূর্বে (১৯৪৬ সালে) এ বই আমি লিখেছি। অর্থাৎ সাহিত্য আসরের দরজার চৌকাটটা তখন আমি দূর থেকে উঁকি মেরে দেখছিলাম। এখন দরজার কাছে (বোধ হয় চৌকাটটা পেরিয়ে?) এসেছি। ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে আসরের মাঝখানে গিয়ে বসি।

সুর বাঁধতে গিয়ে হয় তো পেরিয়ে গেছে কোথাও তালের চৌহদ্দি, দিকপাশ না ভেবে সে আপনার মনে এগিয়ে গেছে। একে যদি বেসুর বলা যায়, তবে বলি, জীবনের সুর-তালভঙ্গের বেদনাই না বার বার মানুষকে নতুন করে সুর বাঁধতে শিখিয়েছে।

প্রায় বছরখানেক ধরে উপন্যাসটির কিছু অংশ 'পরিচয়' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল। নানান কারণে তা মাঝপথেই থেমে যায়। অনেক দিন পরে আবার বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হন তো, সে দোষ আমারই। সাধারণ নিয়মে আর কাহিনীর চুম্বকটা হাজির করলাম না, ওটা পাঠকের হাতেই থাক।

নতুন বলে ভূমিকা লেখার লোভ যতই থাক, 'নয়নপুরের মাটি'র গুণ ও স্বাদ যদি ভাল না হয়, তবে জানি সে বন্ধ্যাই থাকবে। সে বেদনাও আমার।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৫৯
আড়পুর,
শ্যামনগর, ২৪ পরগণা

লেখক

১

খালের ধারে শাবল দিয়ে খুঁড়ে মাটি তুলছিল—মহিম। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে চটকে টিপে টিপে মাটির এক একটা ড্যালা নিয়ে পরখ করে দেখছিল। কিন্তু পছন্দ হচ্ছিল না, আবার শাবল নিয়ে উবু হয়ে খুঁড়ে চলছিল মাটি।

এখন ভর দুপুরবেলা। নিস্তব্ধ খালপার। সূর্য হেলে পড়েছে খানিক পশ্চিমে।

খালের জলের রঙ আর গতি দেখলেই বোঝা যায় নদী খুব কাছেই। তা ছাড়া, খালের এপার ওপারও ছোটখাটো একটি নদীর মতই চওড়া। যতদূরে গেছে, তত সরু হয়ে এসেছে খাল। নদী কাছে বলেই হাওয়ার গতি একটু বেশি।

খালের ধারে বাড়ী ঘরদোর চোখে পড়ে না। খানিকটা দূরেই দু' পারেরই গ্রামের চিহ্ন চোখে পড়ে। পশ্চিম দিকে গিয়ে খাল দক্ষিণে মোড় নিয়েছে প্রায় আধ-মাইলটাক দূরে। এ আধ-মাইল পর্যন্তই গ্রামের চিহ্ন ক্রমশ কালচে ক্ষীণ রেখাতে দিগন্তে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে কয়েকটা বেমানান তাল, নারকেল, দেবদারু জাতীয় উঁচু মাথা। ওগুলো দূরাগত যাত্রীদের গ্রাম বা পাড়া চিনতে সাহায্য করে।

উঁচু পাড়। দেখলেই বোঝা যায় এ দেশের জমি উঁচু, মাটি শুক্‌নো

কিন্তু ফলবন্ত। বিশেষ করে খালের ধারে ধারে এ গ্রামগুলো ঐশ্বর্যবান যে বেশি, তা খালধারের সবুজ শস্যে ভরা মাঠের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। খালের উঁচু পাড়ের জমিগুলো যে পর্যন্ত চোখে পড়ে, প্রায় সম্পূর্ণই দিগন্তবিসারী ধানখেত। সবুজের সোনা। কোথাও কোথাও পাঁশুটে ছোপের হাল্‌কা আভাস দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ধান পাকার দেরি নেই আর।

অজস্র ধারা সূর্যের আলোতে কিশোরী ধানগাছ তার উত্তোলিত গ্রীবা বাঁকিয়ে উঁচিয়ে ধরেছে রসে-গন্ধে-বর্ণে-সম্ভারে পূর্ণ যৌবনকে গা'য়ে ধরতে। তারই নাচন লেগেছে তার হেলানো-দোলানো নরম মাথায় কোটি মানুষকে তার মাতাল ডাকের মাথা দোলানি—ঘরে ঘরে নেশা, চোখে চোখে স্বপ্নের ছায়া ঘনিয়ে নিয়ে আসার মাথা দোলানি।

খালের ধারে ধারে সাদা-কালো বকের ঘাড় কাৎ ক'রে বিচক্ষণ শিকারীর ভঙ্গিতে ধীর বিচরণ চলেছে। পানকৌড়ি পাখী একটা টুকটুক করে জলে ডুব্‌ছে আর উঠ্‌ছে পাতিহাঁসের মত, আর ঘন ঘন তার তীক্ষ্ণ ঠোঁটের ডগায় চক্‌চক্‌ করে উঠছে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফটানো জ্যান্ত ছোট মাছ। আর তাই দেখে দেখে মাঝে মাঝে দু'একটা লোভী বক পানকৌড়ির ঠোঁট থেকে মাছটা ছিনিয়ে নেবার জন্য সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে তার মাথার উপর দিয়ে। কিন্তু হার মানতে হচ্ছে বকগুলোকে। সামনেই একটা বেলগাছের উপর, বোধ হয় পাকা বেল দেখেই একটা দাঁড়কাক নিস্তেজ গলায় কা কা করছে। মাঝে মাঝে আকাশের কোল থেকে শিকারী চিল ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় খালের বুকে। শিকার নিয়ে চিঁ চিঁ কান-ফাটানো ডাক ছেড়ে আবার সোঁ সোঁ করে উঠে যাচ্ছে বহু দূর আকাশে।

সূর্যের তেজ আছে, কিন্তু নারকেল গাছের পাতাগুলো কি সুন্দর

শ্যামল চিকনধারে চক্‌চক্‌ করছে। ঋতু শরতের রঙ এটা। খণ্ড খণ্ড, সর-পড়া মেঘে-ছাওয়া-আকাশ, দেশ হতে মহাদেশান্তরে পাড়ি-জমানো চলন্ত মেঘ। বলা যায় না, খেয়ালী শরৎ কোন মুহূর্তে বলা-কওয়া নেই বাদল ডেকে নিয়ে আসে।

প্রকৃতির লীলা দেখবার এখন সময় নেই মহিমের। সে এখনও শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। তার ঘর্মাক্ত শ্যামলাঙ্গে সূর্যের আলো পড়ে নারকেল পাতার শ্যামল চিকন বর্ণের মতই চক্‌চক্‌ করছে। একমাথা কোঁচকানো এলোমেলো চুল। বহুদিন না কাটার জন্য ঘাড়ের উপর দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে বেয়ে পড়ছে চুল। মাঝে মাঝে ওই মাটি হাতেই রুক্ষ মাথাটা চুলকে, ধূসর মাটির রঙে ছেয়ে ফেলেছে মাথাটা। ভেজা কাদা মাটিতে অনেকখানি ডুবে গেছে পা দুখানি।

তার সামান্য লম্বাটে মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে উঠেছে। পরিশ্রমে আর রোদের তাপে চোখ দুটো হয়ে উঠেছে লাল, কোমল মুখখানিতেও রক্ত জমে শ্যামল মুখ বেগুনী রঙ ধারণ করেছে।

আরও খানিকক্ষণ খুঁড়ে শাবল দিয়ে খোঁড়া অন্ধকার সরু গর্তটায় হাত ঢুকিয়ে দিল সে। আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিয়ে এল এক খামচা মাটি। মাটির বর্ণ দেখেই তার হাসি ফুটল মুখে। টিপে টিপে দেখল। ভারি নরম আর মিহি, যেন বহু কষ্টে চটকানো এক নম্বর ময়দার দলা। টেনে টেনে দেখল। স'জনে আঠার মতই লম্বা হয়ে যায় মাটি, অল্পতেই ছ্যাকড়া মাটির মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় না।

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্তের মুখটা বড় করে নিয়ে খামচা খামচা মাটি তুলে সঙ্গে নিয়ে আসা বালতিটা ভরে তুলল।

ইতিমধ্যে সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। গাছের ছায়াগুলো পূবদিকে লম্বাটে হয়ে পড়েছে।

খালের জল পাল্টা গতি নিয়ে গা' দিয়েছে ভাটার টানে। মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা ভেঙে, ধানখেতের পরপার গাঁয়ের ভিতর থেকে মানুষের সাড়া-শব্দের ক্ষীণ শব্দ আসছে।

নদীর দিক থেকে জলে বৈঠার ছপ্ছপ্ শব্দ তুলে ডিঙি নাচিয়ে নাচিয়ে এল শম্ভু মালা।

এপার নয়নপুর, ওপার রাজপুর।

মহিমকে দেখে শম্ভুর বোঙা মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেল। মুখে একটা দুঃখ প্রকাশ করবার বিচিত্র শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল সে, ওগো, ও মহিম, বলি খাল ধারভারে কাটবা নাকি সবখানি ?

মহিম তখন শাবল রেখে দিয়ে কোমরে বাঁধা গামছাটা খুলে গায়ের ঘাম মুছছে। শম্ভুর কথায় তার ক্লান্ত শুকনো ঠোঁটে একটু সলজ্জ হাসি দেখা দিল। কথার কোন জবাব দিল না।

আরে বাবারে বাবা! ছেলের কাণ্ড ভ্যাখো দি'নি! শম্ভু তার তামাক-খাওয়া কেশো গলায় হেসে বলল, সে কোন্ বেলাতে দেখে গেলাম, মাটি মিলল না এখনো মনের মত ?

তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল ছোট ছোট শাবল দিয়ে খোঁড়া অনেকগুলো গর্তের দিকে চেয়ে। এ যে কাঁ্যকড়ার গর্ত করে ফেলছ গো কুড়িখানেক।

সত্যি, মহিম করেছে কি ? তাকিয়ে দেখল এবার সে নিজের চোখে। এলোমেলো গর্ত করেছে সে অনেকগুলো। আবার তাকাল সে অবিকল একটি মেয়েমানুষের মত সলজ্জ হাসিচোখে শম্ভুর দিকে।

ভারী দিলদরিয়া শম্ভু মালা আবার হেসে উঠে আচমকা থেমে গেল। কিন্তু একেবারে হাসি তার মিলিয়ে গেল না। বলল, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক!

তারপর তার প্রৌঢ় দেহের পেশীগুলোর ওঠা-নামার তালে তালে বৈঠার চাড় দিল জলে। ভাঁটার টান কেটে কেটে ডিঙি এগিয়ে চলল রাজপুরের সদরঘাটের দিকে। কি যেন সে বিড়বিড় করছে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে।

যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ার মত থেমে যায় সে। যেন কেউ তাকে বারণ করে দিয়েছে হাসতে, কথা বলতে। কিন্তু এও লক্ষ্য করেছে মহিম, সেটা আর কাউকে দেখে নয়, একমাত্র মহিমের সামনেই ঘটে থাকে তার এ ভাবপরিবর্তন।

কিন্তু না, এ সব কথা এখন ভাববার সময় নেই মহিমের। মাটি ভরা বালতিটা নিয়ে খাল পাড় থেকে গাঁয়ের পথ ধরল সে।

বাড়ি এসে বালতি থেকে মাটি তুলে নিয়ে একটা কাঠের পাটাতনের উপর রাখল। ঘটিতে জল এনে দুহাত দিয়ে যদৃচ্ছা মত ঘেঁটে চটকে কুটো কাঁটা কাঁকর সমস্ত একটি একটি করে বেছে ফেলল। সে মাটি মোটা চ্যাচাড়ি দিয়ে চেঁছে চেঁছে তুলল একটা মালসায়। তাতে ঘটিখানেক জল ঢেলে সাবধানে আল্‌গোছে তুলে রাখল ঘরের এক কোণে।

মহিমকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ইতিমধ্যে ভিড় করেছে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে। অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে, কৌতূহলে বড় বড় চোখগুলো দিয়ে তারা মহিমের কাজকর্ম দেখছিল। রোজই দেখে। ভিড় করে, গোল হয়ে বসে সবাই দেখে। কথা বলতে বারণ আছে মহিমের। অথও নীরবতার সঙ্গে বিস্মিত কৌতূহলে ড্যাবাড্যাবা চোখগুলো নিয়ে চিরকালই ছোট ছেলেমেয়ের দল ভিড় করে থাকে তার দরজাটির কাছে।

তাকে সমস্ত গুটিয়ে রাখতে দেখে একটি ছোট ছেলে জিজ্ঞাসা করল, এবার কি বানাবে মহিমকাকা?

এবার?

মহিমের টানাটানা চোখ দুটোতে হঠাৎ যেন স্বপ্ন নেমে আসে। চোখের দৃষ্টি অন্তরাবদ্ধ হয়ে যায়। ঠোঁট অদ্ভুত হাসিতে ফাঁক হয়ে যায়। কি অপূর্ব দৃশ্য যেন তার চোখের সামনে রয়েছে, এমনি পলক-হীন বিস্ময়ে মুগ্ধতায় স্বপ্নাচ্ছন্ন তার চোখ। এমনি বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন থাকে সে অনেকক্ষণ।

ছেলেমেয়েরা তর্কযুদ্ধ চালায় নিজেদের মধ্যে। মহিমের দিকে তাদের আর ততটা খেয়াল থাকে না। মহিমের এমনি খেয়ালীপনা তারা অনেক দেখেছে। এমনি কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া, কি যেন ভাবা, এমনি অন্য জগতে চলে যাওয়া। পাগলের মত।

হ্যাঁ, পাগলই হয়ে যায় মহিম তার নিষ্পাপ কল্পনারাজ্যে বিচরণ করতে করতে। সে শিল্পী। ভাবরাজ্যেই তার বিচরণ। তার সে ভাবরাজ্য আনন্দ-বেদনায় আশায় ভরপুর। সমস্ত হৃদয়টুকুর সবখানি অনুভূতি দিয়ে সে তার ভাবরাজ্যকে স্পর্শ করতে চায়, চায় হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত রূপখানি চোখের সামনে এনে হাজির করতে। হাসি মিশ্রিত এক অদ্ভুত কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে সে, বুকটার মধ্যে অযথা টনটনানিতে ফেটে পড়তে চায় যেন! কেন? কেন মনে হয়, বুকটা যেন বড় ভারী, দীর্ঘশ্বাসে তা শুধু আরও ভারী হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুখোমুখি তর্ক থেকে হাতাহাতি লেগেছে।

মহিম গিয়ে সামনে পড়ে থামায়, ধমকায়। দু-একজন ওস্তাদ ছেলেকে কানমলাও দেয়।

গরু নাকি এগুলান্, অ্যাঁ? মারামারি করছে ছাখো!

ও কেন আগেতে মারল, সেটা বল। একজন অভিযোগ করতেই পাল্টা আর এক জনের কান্নামাখানো গলা জবাব দেয়, ছাখো না

মহিমকাকা, আমি বলছি বলে কি, তুমি এবার একটা গণেশঠাকুর গড়বে, আর ও অমনি কুঁজো কানু মালার মত করে ভ্যাংচাল।

এ দরবার এবং বিচার-প্রহসন কতক্ষণ চলত বলা যায় না। হঠাৎ সভাস্থল একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল একজনের আবির্ভাবে। ছোটরা সব টুকটুক সটকে পড়তে লাগল এধার ওধার।

মহিমের বড় ভাইয়ের বউ অহল্যা। এ সংসারের বহুদিনের গিন্নি। ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আজ পঁচিশ বছর বয়সে সন্তানহীনা এই নারী পরিবারটির মধ্যে একমাত্র মেয়েমানুষ। ভাল-মন্দ আপদ-বিপদ— সমস্ত কিছুই যার উপর দিয়ে অহর্নিশ বয়ে চলেছে। সবকিছুতেই তাকে মানিয়ে চলতে হয়, সমস্ত দিক বজায় রেখে এই পঁচিশ বছরের বউটি সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ না হোক, সুখে-দুঃখে এ সংসারকে সে চালিয়ে আসছে। স্বার্থপর নীচ তার স্বামী, মহিমের বৈমাত্রেয় দাদা ভরতের সমস্ত দুঃশাসনকে মুখ বুজে সয়েও সে শান্ত। ভরতের স্বার্থপরতা নীচতা ঘরের চেয়ে বাইরেই বেশি, আর তারই বিষাক্ত ঢেউ ঘরে ঢুকে অপমানে জ্বালিয়ে দেয় তাকে। ভরত ঘর ভরাতে বাইরে যে আঘাত করে, যে নিষ্ঠুরতা নিয়ে চলে—সে তো জানে না—সে নিষ্ঠুরতা তার ঘরের অন্তঃস্থলকেই কি অপমানিত বিষ-তীব্রতায় বিদ্ধ করে।

ন' বছর বয়সে তার বিয়ের সময় মহিম পাঁচ বছরের শিশু। দুরন্ত স্বামীকে জব্দ করতে না পারলেও, এ অতিশিশু আপনভোলা দেওরটিকে সে ভাই-বন্ধুর মত তার বালিকা চঞ্চল হরিণীর ভীত বুকটাতে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিল। আশ্রয় পেয়েছিল তার বাপ-মা-ছেড়ে-আসা ছোট বুকটা ওই শিশুটিরই কাছে।

শিশুটি সেদিন ওকে বুকে করে নিয়ে খেলতে দেখে অহল্যাকে ফুল,

ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল, তোমার কিন্তু দাদার সঙ্গে বিয়ে হইছে, মোর সাথে নয়।

য়্যা? তাই নাকি গো বুড়ো? খিল্‌খিল্‌ করে হেসে কুটোপাটি হয়েছিল অহল্যা। সই-বান্ধবীদের ডেকে ডেকে বালিকা সেদিন তার শিশু অর্বাচীন দেওরটির গম্ভীর বুড়োর মত ভুল ভাঙানোর গল্প বলেছিল। ও মা গো! এ কি বুড়ো ছেলেরে বাবা।

শাসন বলতে যা বোঝায়, অহল্যার পক্ষে মহিমকে তার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন। তবু মাঝে মাঝে ধমক দিতে হয় বই-কি। থাকতে হয় রাগ করে, না খেয়ে, কথা না বলে, যদি শান্ত মহিম কখনো-সখনো বেআদবি করে বসে।

সবই ঠিক ছিল, তবু নিতান্তই অহল্যার বাঁধা বীণার তারে কোথায় যেন কোন্ তারে একটুখানি বেসুর বাসা বেঁধেছিল। কোথায় যেন ছিল ছোট্ট একটি কাঁটা, আর একটুখানি ক্ষত, সেখানে অনুক্ষণ ক্ষতে আর কাঁটায় খোঁচাখুঁচিতে অনুদিন রক্ত ঝরে। সে কি অহল্যার এই পঁচিশ বছরের রসে-গন্ধে ভরা, মহান যৌবনের ভারে বলিষ্ঠ দেহ-বৃক্ষটির মূল ফলহীনা বলে? অহল্যার সন্তানহীনতাই কি সেই হারানো সুর?

কিন্তু সেদিক থেকে সকলেই নির্বাক। ভরতের কোন অভিযোগ থাকলেও সে আশ্চর্যরকম নীরব এই ব্যাপারে। মহিমের এ চিন্তা কখনো মনে এসেছে কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ সংসারটির যত সমস্ত চিন্তা-ভাবনা অহল্যার একলার।

অহল্যা মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে, ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট চেপে ক্ষুদে পলাতকদের চেয়ে দেখে। মহিম ইতিমধ্যেই একবার অহল্যার মুখভাব দেখে নেয়। বউদি যে রেগেছে একথা বুঝতে পেরেই সে কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই অহল্যা ধমকে উঠল, থাক্। মাটি কাটা হইছে তোমার?

বড় ভাল মাটি পেয়েছি আজ, জানলে? হাতে নিলে মুখে দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

ত, তাঁই দেখলেই পারতা!

যেমন চকিতে এল, তেমনি চকিতে দড়াম্ করে দরজা ঠেলে অহল্যা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এ রাগ অনর্থক নয়, মহিম তা বুঝতে পারে। খুব সম্ভবত তার মাটি কাটার দেরির জন্যই এ রাগ। কিংবা হয়ত ভরত কিছু বলেছে, না হয় তো ঝগড়া করেছে পড়শীদের কারুর সঙ্গে। সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও এমনি রাগ মাঝে মাঝে করে থাকে অহল্যা।

সে কিছু না বলে বড় ঘরের দাওয়া থেকে খড়মজোড়া আর গামছাখানা নিয়ে বাড়ির পিছনের ডোবায় গিয়ে নামে। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে, গুটনো কাপড়টা ঠিকঠাক করে একেবারে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির হয়।

নেও, কি হইছে কও। অপরাধজনিত হাসি নিয়ে অহল্যার কাছখানটিতে বসে সে।

কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না অহল্যা। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি থেকে হাতায় করে আধসেদ্ধ চাল নিয়ে টিপে টিপে দেখে। দেখে ভাত ক'টা হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাৎ করে ঘটি থেকে জল নেয় ডান হাতে। হাত শুদ্ধ করে বড় একটা মানকচুর আধখানা কেটে নিয়ে ফেলে দিল হাঁড়িতে।

হাত চলে, কাঁচের আর পিতলের চুড়িগুলো ঠুন্‌ঠুন্ করে বাজে। কিছুক্ষণ মহিমও কোন কথা বলে না। দেখে আর শোনে। নিস্তব্ধ থমথমে মুখখানি অহল্যার ধোঁয়ায় আর আলোতে ঝাপসা। সাবেকী নাকছাবিটা চিকচিক্ করে ওঠে থেকে থেকে। বৌদিকে দেখলে মাঝে

মাঝে বনলতাকে মনে পড়ে মহিমের। বৈরাগীর মেয়ে বনলতা। তিনটি স্বামীকে সে পর পর হারিয়েছে। লোকে বলে, খেয়েছে। সত্যই তাই, বনলতার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করতে ভরসা হয় না কারুর বড় একটা। বনলতাও মাঝে মাঝে এমনি কারণে অকারণে মহিমের উপর রাগ প্রকাশ করে থাকে অহল্যার মত, নিস্তব্ধ থমথমে মুখে। তবে সে হল অন্য কারণ, অন্য রকম।

অহল্যার অভিযোগ তো তাকে শুনতেই হবে। এ যে ঘর, ঘরের ব্যাপার। সম্বন্ধ আলাদা, আলাদা কারণ।

এখানেও আছে মান-অভিমান রাগ-দুঃখ, আছে বন্ধুত্ব। তার সঙ্গে আছে দায়িত্ব, কর্তব্য। বনলতা প্রতিবেশিনী, শৈশবের বন্ধু, একসঙ্গে পাঠশালায় পড়েছে। সেখানকার বন্ধুত্বে দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই—নেই ভার।

কি করেছি, কও, মহিম অধৈর্যের সঙ্গেই বলে, কিন্তু হাসেও।

অহল্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চোখে একবার মহিমের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ ঝেঁজে ওঠে, তোমরা ভেবেছ কি বল তো! মোরে কি পাগল করে ছাড়বা?

তা কি করেছি, বলবা তো?

বলব? দেখে মনে হয় আরও রেগে উঠেছে অহল্যা, সেই সকালে তোমাকে বলে রাখছি কি যে, ও বেলাতে পাতুর দোকান থে' মশলাপাত আর তেলটুকুন এনে দিও। তা, খুব তো দিলে?

মহিম প্রকাণ্ড বড় করে জিভ কেটে একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ইস্, মাইরি বলছি বউদি, একেবারে ভুলে গেছি।

তো ওই রকম ভুলে থাকো। তা হলেই রান্না খাওয়া সব হবেনে।

বলে সে উনুনে আগুন উস্কে দিতে দিতে আপনমনে বলে, কে

বলবে এ বাড়িতে দুটো পুরুষমানুষ আছে। আজ এরে বলি, কাল ওরে বলি—এটা এনে দাও, ওটা এনে দাও। কেন রে বাপু?

সাংসারিক অভিযোগ যতগুলো আছে, সবগুলো যেন হুড়মুড় করে এখনই মনে আসতে লাগল সব অহল্যার। ক'দিন ধরে বলছি ডোবাটাতে আর নামা যায় না কোদাল কুপিয়ে ধাপ দুটো কেটে দিও। তো সে কাকে বললাম। যেমন দাদা, তেমনি ভাই। একজন বেরুল, এর পেছনে কাটি দিতে, অমুকের মাথা ফাটাতে, মামলা লড়তে। আর একজন তো ভ্যালা মাটির কারবারে ফেঁদে বসেছেন।

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল অহল্যা, তোমরা আর জ্বালিও না বাপু। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই, যেদিকে যায় দু'চোখ। এক সকালবেলা চেয়েচিন্তে তেল-মশল্লার কাজ চলল কোন রকমে। চাইব আর কত মানুষের কাছে। নেও, আর জিভ বের করে মা কালীর মত—

পেছন ফিরে হঠাৎ থেমে গেল। ওমা, কাকে বলছে সে এত কথা। যাকে বলা, সে কোন্ ক্ষণে বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ কেমন মায়া লাগে, হাসি মিশ্রিত করুণায় বুকটার মধ্যে নিঃশ্বাস একটু ভারি হয়ে উঠল তার। আহা, অমন করে না বললেই হত। সেই জিভ কেটে লাফিয়ে ওঠা দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষটা ভুলে গিয়েছিল। আপনভোলা গোবিন্দ একেবারে।

কিন্তু রাগ না করে, না বিরক্ত হয়েই কি উপায় আছে অহল্যার। অত ভুলোকে নিয়ে তো সংসার চলে না। একজন যদি ভুলো হয়েছে আর একজন হয়েছে নষ্টামোর মহারাজা। মহিমকে তবু দুটো কথা বলা চলে, ভরতকে মুখের কথা বললে সে এক কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলবে। তবে সংসারের পুরুষ মানুষের কাজগুলো করবে কে? আপসে আপসে

চলবে না তো। ডোবার ধার কেটে না হয় অহল্যাই নিয়েছে, নেয় না হয় ছোটখাট এদিক ওদিককার দু-চারটে কাজ চালিয়ে কোন রকমে করে কম্মে। তা বলে পাতুর দোকানে ওই মিন্‌সের মেলায় তো পারে না অহল্যা সওদা আনতে যেতে। যেতে অবশ্য কোন বাধা নেই, যেয়ে থাকে তাদের ঘরের কত বউ-ঝি বাজারে দোকানে হামেশাই। কিন্তু ভরত সেদিক থেকে ভদ্দরলোক হয়েছে। মেয়েমানুষের আব্রু রাখতে শিখেছে সে। শিখেছে তার বাপের কাছ থেকেই। অবস্থাবিশেষে যে একদিন মহাজন সেজে বসেছিল গাঁয়ে। হ্যাঁ, কামিয়েছিল ভাল ভরতের বাপ দশরথ। কিন্তু রেখে তো যেতে পারেনি কিছুই, কিছু পরিমাণ জমি ছাড়া। কিন্তু ওই জমির সঙ্গেই দশরথ রেখে গেছে এই আব্রুটুকু বামুন কায়েতদের মত, আর জাতছাড়া সৃষ্টিছাড়া যত ফষ্টিনষ্টি।

কই গো, মহিম বাড়ি আছ নাকি?

বাড়ির সামনে দেবদারু গাছের অন্ধকার তলাটা থেকে মোটা ভারি গলায় ডাক শোনা গেল। গলাটা পরিচিত, কিন্তু মানুষটাকে চিনল না অহল্যা। জবাব না দিয়ে সে চুপ করে রইল। উদ্দেশ্য, সাড়া না পেয়ে ফিরে যায় যাক্। কিন্তু আবার বলল লোকটা এবার দু-চার পা এগিয়ে এসে। ঘরে আলো রইছে দেখছি। বাড়ীর লোকজন গেল কই?

কেন, কে তুমি? কেরোসিনের ল্যাম্পটা নিয়ে এবার অহল্যা রান্নাঘরের দরজাটার সামনে দাঁড়ায়।

মহিম আছে?

ল্যাম্পের আলোয় অহল্যা লোকটাকে ভাল করে চিনতে পারল না। বলল, না।

আমি বাবুদের বাড়ি থে আসছি। মহিম এলে পরে বাবুদের সঙ্গে

একটু দেখা করতে বলো, বুঝলে? লোকটা কথা শেষ করে চলে যাওয়ার পরিবর্তে আরও দু'পা এগিয়ে এল।

বাবুদের বাড়ি মানে, জমিদারের বাড়ি। সেখানকার এ আকস্মিক ডাকে চকিতে মনটা উৎকণ্ঠায় ভরে গেল অহল্যার।

কি জানি, কি গোলমাল বাধিয়ে এসেছে হয়তো আবার।

লোকটা হঠাৎ দ্রুত আরও কয়েক পা এসে হেসে বলল, কে, ভরতের বউ নাকি?

অহল্যা একটু চমকে উঠল। ভাল করে আলো ধরে লোকটার মুখ চিনে এবার হাসল, কে, পরান দাদা? আমি বলি—কে না জানি। তা ঠাকুরপোরে ডাকল যে হঠাৎ তোমাদের বাবু?

হাত উলটে বলল পরান, কি জানি, কি পিতিমে না কি করবে বুঝি তাই।

এমন সময় মহিমও এল পাতুর দোকান থেকে সওদাপত্র নিয়ে। বলল, কি হয়েছে পরানদা?

তোমার ডাক পড়েছে ভাই, একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করে এসোগে।

পরান চাকর, ছোট জাত, কিন্তু বড় মিষ্টি তার স্বভাব। জাতে বাগ্দী হলেও আজীবন বাবুদের বাড়িতে থেকে বাবুদের মতই তার মোলায়েম কথাবার্তা। তা ছাড়া, বাবুরা যখন কলকাতায় গিয়ে বসবাস করে, পরানও বরাবর তাদের সঙ্গী হয়।

আমার যে আবার একটু অন্য জায়গায় দরকার ছিল। ক্ষণিক দোমনা করে আবার বলল, আচ্ছা চল দেখি, ঘুরে আসি একটু।

রাতটুকুন পুইয়ে এসো না যেন। পিছন থেকে কথাটা ছুঁড়ে দেয় অহল্যা মহিমের প্রতি।

মহিম বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসি তো আসব।

মহিম শিল্পী।

মহিমের বাবা দশরথের অবস্থা ভালই ছিল। যৌবনে অমানুষিক পরিশ্রম করে সে তার অবস্থাকে দাঁড় করিয়েছিল স্বচ্ছল। কারণ ছিল অবশ্য এর পিছনে।

যে সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে দশরথ মানুষ হয়েছে, সেখানকার দীনতানীচতা কাটিয়ে—মাঠের মানুষ দশরথের মনে একদিন যে আলোড়ন উঠেছিল—সেই আলোড়নেরই সাক্ষী তার অতীত-কৃত বর্তমানের স্মৃতিগুলোতে। তার ভিটাতে সেই চিহ্নই বর্তমান।

স্বার্থপর ছিল দশরথ নিঃসন্দেহেই। তা নইলে অর্থকে পরমার্থ বলে চিনেছিল কি করে। কিন্তু স্বার্থপর হলেও চাষী—আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল তার প্রবল। সকলেরই সেই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—ছিল সব চাষীরই। কেউ-ই তার নিজের অবস্থাতে সুখী নয়। কিন্তু দশরথের মনে তা যেন ভিন্ন ভাবে দেখা দিয়েছিল।

ক্ষুব্ধ দশরথ দেখেছিল কি প্রচণ্ড ঘৃণায়-দীনতায়-হীনতায় মিশে তাদের জীবন। জাতি হিসাবে বর্ণহিন্দুদের প্রবল প্রতাপ, ছোট জাতকে অপমান করবার মহান অধিকার নিয়েই জন্মেছে যেন ঐই বর্ণহিন্দুরা। প্রতিটি সামান্য কারণে তাই দশরথ চিরকাল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এই সমাজের বিরুদ্ধে, প্রতিটি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য—তাদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে অত্যন্ত রূঢ় প্রতিবাদ করে, যে জন্য তার জাতি-ভায়েরা পর্যন্ত সংকোচ আর ভয়ের সঙ্গে প্রায় ত্যাগ করতে বসেছিল তাকে।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঘৃণায় সেদিন দশরথেরও গা'টা ঘুলিয়ে উঠেছিল। চরম দারিদ্র্যই যে এর কারণ এ কথা জানতে পেরে। সেই থেকে তার মনে কি বদ্ধমূল আশা জুড়ে বসল—বর্ণহিন্দু না হোক, ভদ্দরলোক হতে তার আপত্তি কোথায়?

পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে লাভ নেই। তবে এই পর্যন্ত, দশরথ লড়েছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। তার সেই একক প্রচেষ্টা কার্যকরীও হয়েছিল। একজন কেউকেটা গোছেরই হয়েছিল সে, অবিকল ভদ্র-লোকদেরই মত অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার। বর্ণহিন্দুদের অনুকরণে গড়ে তুলেছিল সে নিজের পারিবারিক জীবন। মূল্যও পেয়েছিল বই-কি! বর্ণহিন্দুরা খাতির করেছে তাকে, দেখেছে সমান নজরে। আপনি আজ্ঞে না করলেও তার অন্যান্য জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মত তুই তোকারিও করেনি।

ফলে যে দশরথ চাষী মাঠে লাঙল বয়েছিল এককালে, তার ছেলেদের সে কোনকালের তরেও পাঠায়নি মাঠে। খুব বড় আশা ছিল তার—লেখাপড়া শিখবে তার ছেলেরা।

কিন্তু ভরত সেদিক থেকে তাকে প্রচণ্ড ভাবেই নিরাশ করেছিল সে জীবিত থাকতেই। মহিমের শিক্ষার অঙ্কুরোদ্গম দেখে গেছে সে। মৃত্যুর সময় শিশু-মহিম তাকে কোন আশাই দিতে পারেনি তখন।

যদি বেঁচে থাকত তা হলে দেখে যেতে পারত, তার এই ছেলেটি শুধু পড়াশুনো ব্যাপারে নয়, অনেক খেয়ালে, বিচিত্র মানসিকতার গুণে কি অপূর্ব। আর দেখে যেতে পারত, তার এই ছেলেটি সেই ছোটকালটি থেকে—কেমন করে মনের রূপকে মাটিতে রূপ দেয়।

তখন মহিম শিশু। দুর্গা পূজা এগিয়ে আসছে। কুমোরেরা মূর্তি গড়ছে মাটির, সমস্ত দেবদেবীদের। স্কুল পালিয়ে মহিম তখন শুধু

কুমোরবাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করেছে। শিশুর সেই বিস্ময়ান্বিত চোখের সেদিন পলক পড়তে চাইছিল না মাটির পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, নেই লেখাপড়া, একমাত্র কাজ মাটির পুতুল বানাবার কারিগরি দেখা। প্রয়োজন মত ব্যস্ত কারিগরদের ফাই ফরমাস-খাটা থেকে শুরু করে ইস্তক তামাক ভরে দেওয়া পর্যন্ত। কিছুই বাদ যায়নি। প্রতিদানে শুধু, তাকে ভাগিয়ে না দিয়ে চুপচাপ বসে সেই মূর্তি গড়া দেখতে দেওয়া। কুমোর তুলি টেনেছে, মহিম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাকিয়ে থেকেছে তুলির ডগাটিতে। এই বুঝি সরস্বতী মায়ের চোখের একটা মণি একটু বড় হয়ে গেল। গেছেও এমন কত সময়। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে মহিম। এ কি করলে? হ্যাঁ, বিরক্ত হয়েছে অনেক সময় কুমোর কারিগরের দল। ছোঁড়াটার অনেক কথাই তাদের অতি ক্লান্ত মেজাজে এনে দিয়েছে রাগ, রুক্ষতা, রূঢ়তা। তার পরম গুরু অর্জ্জুন পালও এক এক সময় বিরক্ত হয়ে দিয়েছে লাগিয়ে থাই থাপড়, দিয়েছে হটিয়ে সেখান থেকে। তবে হ্যাঁ, অর্জ্জুন পাল ভালবেসেছিল মহিমকে। বুঝেছিল, ছেলেটার চোখে যেন থেকে থেকে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ভর্ করে।

মহিম ফিরে এসেছে ঘরে। তারপর বয়ে বয়ে এনেছে তাল তাল মাটি। মূর্তি গড়েছে ভেঙেছে, কেঁদেছে, রেগেছে, থেকেছে উপোস। মার খেয়েছে ভরতের, ধমকানি খেয়েছে অহল্যার, কিন্তু শিশুর বুকে মমতাময়ী এক রুদ্ধ বেদনায় মূক করে দিয়েছে তাকে! মনের চেহারা, হাতের মাটিতে দেয় না ধরা। আঃ! সে কি অসহ্য কষ্ট আর অশান্তি। যা চাই, তা কেন পাই না? আবার গেছে ছুটে ছুটে, দেখেছে কারিগরদের কাজ। আবার তৈরী করেছে মূর্তি।

পেয়েছে, অনেক কষ্টে তারপর পেয়েছে। আর কিছু নয়, হাত

খানেক লম্বা দশভূজার মূর্তি একখানি। পাগল, ছেলেমানুষ। চাষা দশরথের ছেলে আবার সেই মূর্তির পূজোও করেছে। গাদা ছেলেমেয়ের দল এসেছে আবার সেই ঠাকুর দেখতে। মহিমের হাতে গড়া ঠাকুর ওমা! এ যে সত্যি সত্যি দুগ্‌গা পিতিমের মতই হয়েছে গো! শুধু মহিমের সঙ্গী সাথীরা নয়, ওই ভরত অহল্যার মত অনেক ভারী বয়সের মেয়ে পুরুষের মুখ থেকেই সেদিন ওই কথাগুলো ঘন ঘন বেরিয়ে গৌরবান্বিত করেছে শিশু-শিল্পীকে।

সেই আরম্ভ হল। কয়েক বছর কাটল—শুধু ঠাকুরের মূর্তি গড়ে। এদিকে লেখাপড়া যদিও চলল, কিন্তু তার দৌড়টা এল ঝিমিয়ে। ছেলে মূর্তি গড়তে পাগল। তার প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাল সবাই। তাই তাকে আরও পাগল করে তুলল। বহু কাগজের বহু ছবি ঘেঁটে দেখল ভাস্কর্যের নতুন পুরনো মহিমময় কীর্তিগুলো। এত মহান, এত বিরাট, এত সুন্দর এই কাজ!

এক বিচিত্র স্বপ্ন বাসা বাঁধল কিশোরের বুকে। শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন।

ঠিক সময়ে এসে জুটল বামুনপাড়ার লেখাপড়া জানা পাগলটা-গৌরাঙ্গসুন্দর। মহিমের চেয়ে সে বড়, কিন্তু বন্ধুত্বে আটকাল না একটুও। সে তার স্বপ্নকে দৃঢ় করল, শোনালো দেশী বিদেশী শিল্পীদের বিচিত্র সব জীবনের কাহিনী।

শুনতে শুনতে স্বপ্ন ছেয়ে আসত মহিমের চোখে।

আর সেই এক মাথা চুল, স্বপ্নালু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধ'রে পাগলা গৌরাঙ্গ বলত—হবে, তোমার দ্বারা হবে।

তারপর পাগলা গৌরাঙ্গ মহিমকে নিয়ে একদিন পাড়ি জমাল কলকাতার দিকে, তার চোখের সামনে খুলে দিতে একটা জগৎকে।

সে কি অসহ্য উত্তেজনা মহিমের! রাজধানীর মিউজিয়ম চিত্রশালা,

আর্টস্কুল, কিছু বাদ পড়ল না। অজস্র কৌতূহল আর বিস্ময়ে ভরা চোখ দুটোতে। উঃ, কি বিরাট আর কি বিচিত্র! কৃষ্ণনগর ঘুরে প্রেরণা পেল মহিম আরও বেশী। দেশী কারিগরির সেটা যেন সোণার খনি। বাবার থানের মত লুকিয়ে সে প্রণাম করেছে কৃষ্ণনগরের মাটীকে।

পাগলা গৌরাঙ্গ বলল, থেকে যাও কলকাতায় আমার সঙ্গে। পৃথিবীর সেরা শিল্পী করে ছেড়ে দেব তোমাকে।

কিন্তু এত বিস্ময়, এত কৌতূহল, এত আগ্রহ, তবু প্রাণ যে হাঁফিয়ে উঠেছে মহিমের। কলকাতার কথা কত শুনেছে, কিন্তু এ তো তার সেই মনে গড়া কলকাতা নয়! এ যে অপরিচিত দেশ, অপরিচিত পরিবেশ, অচেনা সব লোক। প্রাণ যে কাঁদছে সেই নির্জন খালপাড় গ্রামটির জন্য, সেই গ্রামের মানুষগুলোর জন্য। প্রাণ যে উড়ছে সেই উড়ো অস্থায়ী মেঘেঢাকা অসীম আকাশের বুকে, পড়ে আছে দিগন্তবিসারী মাঠের মাঝে!

সমস্ত শিল্পের খনি এ কলকাতা। কিন্তু এ খনির গর্ভে থাকতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে আসবে মহিমের। এখানে সে পারবে না থাকতে।

পাগলা গৌরাঙ্গ তো—পাগলাই। সে মহিমকে যেতে দিল না। ফিরে গেল এককালে সে যে মেসে থেকে পড়াশুনা করেছে, সেই মেসে। সেখানে একখানা ঘর নিয়ে মহিমকে আটকে রাখল সে। বনের পাখী মানুষের মত কথা বলবার উদ্যোগ করতে, মানুষের খাঁচায় বাঁধা পড়ার মত হল মহিমের অবস্থা। মুখে রইল শান্ত, কিন্তু ভিতরে ঝড়। অনুরাগ কমল না শিল্পের প্রতি, কিন্তু প্রাণটা যেন জগদ্দল পাথরের চাপে পিষ্ট হচ্ছে।

পাগলা গৌরাঙ্গ টের পেল সবই। টের পেল যে তার কিশোর শিল্পী কয়েকমাসের মধ্যেই অসম্ভব রকম রোগা হয়ে গেছে। প্রাণ খুলে

হাসতে পারে না, কথা বলতে পারে না। সেই স্বপ্নালু চোখ দুটোতে স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না। ভাবল, শিল্পচর্চা আর একটু জমে উঠলেই আবার স্বাস্থ্য ফিরে আসবে, মুখের দুশ্চিন্তার রেখাগুলো পড়ে যাবে ঢাকা। ওর আজকের এই গ্রাম-ছাড়া, পরিজন-ছাড়া শুকনো বিষাদ মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠবে ধন্যবাদের উচ্ছ্বসিত শব্দ ভবিষ্যতে কোন একদিন পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতি। আর সেদিনও বেশি দূরে নয়।

এদিকে গাঁয়ে-ঘরে, বিশেষ করে, মহিমদের পাড়াটাতে এই নিয়ে কথা হল বহুরকম। রাগ করল কেউ, ভয় পেল কেউ, দোষ দিল অনেকে ভরত আর অহল্যাকে পাগলের সঙ্গে ছেলেকে এরকম ছেড়ে দেওয়ায়। কৈফিয়ৎ চাইল অনেকে পাগলা গৌরাঙ্গের বাপের কাছে। বামুন বলে খাতির নাই, ছেলে কোথায় বার কর।

মুখে খুব চোটপাট করলেও শংকিত হল পাগলা গৌরাঙ্গের বাপও। ভাল ফ্যাসাদ করেছে তার ছেলে। কলকাতার পুরনো মেসের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে সব খবর নিয়ে তবে সে ঠাণ্ডা করল ভরতকে আর তার প্রতিবেশীদের।

শেষটায় মেয়ে-পুরুষেরা মুখ টিপে হাসাহাসি করল। চোখ টিপল এমনভাবে, যেন গাঁয়ের কোন মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে কেউ কলকাতায়।

কিন্তু কান্না বাঁধ মানল না অহল্যার। সে ছাড়ল খাওয়া পরা, কথা বলা। ইস্তক, ভরতের ভরা যৌবনের মধুময় রাতগুলোকে পর্যন্ত কান্নায় ঝগড়ায় এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল। যেন ভরত তার কেউ নয়, প্রাণ-পতিই তার হয়েছে দেশান্তরি। ভাল জ্বালায় পড়ল ভরত। স্নেহ মানে না, আদর মানে না, মানে না রাগ পীড়ন। এ এক হয়েছে অদ্ভুত দেবর-সোহাগী।

প্রায় তিন বছর কাটতে চলল।

শেষটায় একদিন আচমকাই মনে পড়ল ভরতের। তাই তো, ঘরে একটা ছেলেপুলে নাই, নাই কথা বলবার লোক, মেয়েমানুষ একটা থাকে কেমন করে ঘরে?

সে পাগলা গৌরাঙ্গের বাপের কাছ থেকে কলকাতার ঠিকানা নিয়ে কলকাতা যাওয়ার আয়োজন করল। হারামজাদা ছোঁড়াকে ধরে নিয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সৎ ভাই কি না! নইলে ভাই-ভায়ের বউকে ভুলে থাকে কি করে এমন দূর বিদেশে?

ভরত যাবে তো, অহল্যা বলে—আমিও যাব। সামান্য কান্নাকাটিতেই ভরতের মন থেকে বাধাটুকু ঝরিয়ে ফেলল সে। দুদিনের ঝামেলা বই তো কিছু নয়। ভরত আপত্তি করবে কেন?

ইদানীং অবশ্য সে অহল্যার কোন আবদারেই আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ আর যাই হোক, বাল্য-বিবাহের রসও তো তার উঠছিল পেকে। সময়টাই যে পড়েছিল তখন আত্মসমর্পণের। অহল্যার কাছে ভরতের আত্মসমর্পণ।

কলকাতায় পাগলা গৌরাঙ্গের মেসে এসে উঠল ভরত আর অহল্যা, দূর বাংলার এক চাষী দম্পতি—যা তাদের চোখে মুখে পোশাকে স্পষ্টই প্রতীয়মান।

প্রায় তিন বছর পর দেখা। অহল্যা ছুটে গেল মহিমকে দেখতে পেয়ে। ছোটার বেগটা মহিমেরও কম নয়। সে-ই আগে ঝাঁপিয়ে পড়ল অহল্যার বুকে। তারপর হাসিতে চোখের জলে একাকার কাণ্ড। ভরত খানিকটা লজ্জিত দর্শক ছাড়া আর কিছু নয়। পাগলা গৌরাঙ্গ ভ্রূ কুঁচকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মুখে এ দৃশ্য দেখল। যেন বাধা পড়েছে তার [illegible] সাধনায়।

কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

এবার ফুরসৎ হল অহল্যা আর ভরতের ঘরটার চারদিক দেখবার—ঘরটা নিতান্তই তাদের দেশী কুমোরের ঘরের মত না হলেও তারই এক গম্ভীর ও পরিচ্ছন্ন সংস্করণ। মূর্তিগুলোরও কোন মিল নেই তাদের কুমোরের গড়া পুতুলের সঙ্গে, আগে মহিমও যে ছাঁদে গড়ত প্রতিমা।

সবচেয়ে বেশি উতলা হল অহল্যা। ঘরের চারদিক ঘোরে আর তার গেঁয়ো বিস্মিত চোখ দিয়ে কি এক অদ্ভুত বস্তু যেন নিরীক্ষণ করতে থাকে।

এ সবই তুমি গড়েছ? সে তার পাড়াগেঁয়ে কৌতূহলে যেন ফেটে পড়বার উপক্রম করল।

হ্যাঁ। মহিমের বুকে উচ্ছ্বসিত আলোড়নের খেলা চলেছে। এই কথা, এই বিস্ময়—সবই তো তার গুণমূল্য! মুখখানি তার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

এটা আবার কোন্ দেবতা?

বুদ্ধদেব।

কে বুদ্ধদেব অহল্যা তা জানে না। তবু হাত তুলে প্রণাম করল সে। কি টানা টানা বিশাল ধ্যানস্থ চোখ, কি সুন্দর নাক, ঠোঁট, কি বাহার চুলের আর গলার মালাটির।

আর এটা?

হর-পার্বতী।

হর-পার্বতী? লজ্জা পেল অহল্যা, কৃত্রিম কোপে মুখটি তার অদ্ভুত হয়ে উঠল। এ কেমন হর-পার্বতী! এক বিরাট পুরুষ, আর তার পাশে পার্বতী, খালি যৌনাঙ্গটুকু কয়েকটি মণিমাণিক্যে ঢাকা, আর সবই উলঙ্গ। বিশেষ বলিষ্ঠ স্তনযুগলই আরও লজ্জা দিয়েছে অহল্যাকে।

ছোঁড়ার মাথাটা দেখছি খেয়েছে পাগলা গৌরাঙ্গ। এমনি উলঙ্গ নারী মূর্তি অনেক কটাই রয়েছে। এসব কি পাথর, না মাটির?

মহিম হেসে উঠল বউদির কথায়। পাথর কোথায় গো! সবই মাটির। তবে যে-সে মাটি নয়, কিনে আনতে হয় পয়সা দিয়ে এ মাটি। ঘরে বসে এর মসলা তৈরি করতে হয়।

মাত্র দু-তিন বছরের অবর্তমানে যেন বহু অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে মহিম। আর সেই খালধারের নয়নপুরের চাষী দশরথের ছেলে, অহল্যার বাধ্য দেবরটি বুঝি নেই। কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল অহল্যা। মহিম কি দূরে সরে গেছে, হয়ে গেছে অন্য মানুষ! যার নাগাল কোন রকমেই অহল্যারা পাবে না? এমনি পর পর, মার্জিত বাবু-ভদ্দরলোকের ছেলেদের মত, যাদের সঙ্গে অহল্যাদের কোন সামঞ্জস্যই নেই—তাদের মতই হয়ে গেছে বুঝি মহিম! মহিমের কথাবার্তাও সন্দেহ জাগায়, সে যেন বড়সড় হয়ে উঠেছে অনেক। মাত্র তিনটে বছরের ব্যবধান, এর মধ্যেই কত বড় আর মানুষ হতে পারে। কিন্তু মহিম যেন স্বাভাবিক বাড়কে ছাড়িয়ে উঠেছে। কেমন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল অহল্যা। যেন সে চায় না, কোন দিনই মহিম বড় হবে। থাকবে চিরকালের সেই নরম ছোট্টটি, ছেলেমানুষ, যার উপর অহল্যার আধিপত্য থাকবে আগেরই মত পুরো পরিমাণে।

হ্যাঁ, এতদিন পরে মহিমেরও তো আছে কিছু দ্রষ্টব্য, যা দিয়ে সে এই চিরকালের পাড়াগেঁয়ে দাদা-বউদিকে খানিকটা চমকে দেয়। তার উৎসাহ তো সেইখানেই বেশি, যেখানে সে যত বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারবে। তার প্রাপ্য এই চমকানি, এ বিস্ময়। সে তার কথায় কাজে সব দিয়ে সবখানি মূল্য চায় ফিরিয়ে নিতে।

কিন্তু অহল্যার এ ভয় কেন?

তা তো অহল্যা জানে না। সে শুধু জানে, যে সংশয় যে সন্দেহ তার মনে এসেছে, তাই যদি হয় কার্যকরী, তবে বুঝি বাঁচবে না। তাই যাচাই করে নেওয়ার জন্যই সে দৃঢ় গলায় গম্ভীর হয়ে বলল : মোরা কিন্তু তোমারে নিতে আসছি। ঘরে ফিরে যেতে হবে এবার তোমার।

মহিমের চোখে ফুটল যেন বহুদিন পরে মায়ের সঙ্গ পাওয়া সন্তানের ব্যাকুল আনন্দ, আমিই বুঝি তোমাদের আর একলা একলা নয়নপুরে ফিরে যেতে দিচ্ছি ?

মহিম বেঁকে বসলে ভরত কি বলত বলা যায় না। এখন সে হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল, কেন, থাক না আরও কিছুদিন বিদেশে হতচ্ছাড়া কোথাকার! চল নয়নপুরে, গোবেড়ন লাগাব তোমাকে।

মহিম ভয় পেল না। আর কিছু না হোক, এটা সে বুঝেছে, দুশো মাইল তফাৎ থেকে যারা ছুটে আসে—তারা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া মাত্র গোবেড়ন দেওয়ার পাত্র নয়।

অহল্যা বলে, হয়েছে, থাক্। তারপর এক টানে সে তার জামাটা খুলে ফেলল।

এদিকে সারারাত্রি পাগলা গৌরাঙ্গের পাত্তা নেই। শঙ্কিত হল অহল্যা আর ভরত। মহিম নিশ্চিন্ত মনে বলল, ভাববার কিছু নেই, উনি ওরকম করে থাকেন।

পরদিন রুক্ষবেশে ফিরে এলেন পাগলা গৌরাঙ্গ। মহিমরা তখন কলকাতার গল্পে মত্ত।

বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েই পাগলা গৌরাঙ্গ ডাকল মহিমকে। মহিম অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তুই নয়নপুরে ফিরে যাবি ওদের সঙ্গে ? ভীষণ গম্ভীর শোনাল তার গলা।

মহিম প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর এক কথায় বলল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ? হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে পাগলা গৌরাঙ্গ প্রচণ্ড বেগে একটা ধমক দিয়ে কিল চড় মেরে মহিমকে শুইয়ে ফেলল তার পায়ের কাছে। যেন মহিমের প্রতি কি প্রচণ্ড আক্রোশ তার।

অতবড় যণ্ডা মানুষ ভরতও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যাপার দেখে। একমাত্র অহল্যারই বুকটা দারুণ রোষে ওঠা-নামা করতে লাগল। ফুলে উঠল নাকের পাটা দুটো। বাঘিনীর মত ছিনিয়ে নিয়ে গেল সে মহিমকে।—কেন মারছ ছোঁড়াকে এমন করে, জিজ্ঞেস করি? মগের মুলুক পেয়েছ?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে পাগলা গৌরাঙ্গ হিসিয়ে উঠল; মহিমের দিকে চেয়ে, যা, চলে যা। তারপর ঘরে ঢুকে মহিমের জামা-কাপড় সব ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়।

একমাত্র অহল্যাই বিহ্বল হল না। সে সব বেঁধেছেঁদে নিতে লাগল। ভীষণ অপমানে জ্বলে যাচ্ছে সে। যাওয়ার ব্যবস্থা যখন তৈরি হয়ে গেল, তখন বহু দ্বিধা কাটিয়ে মহিম একবার ঘরে ঢুকল।

পাগলা গৌরাঙ্গ তখন বুদ্ধ মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, এ ঘরের কিছু তুই পাবি না। যা, চলে যা। বলে আঙুল দেখিয়ে দিল সে দরজার দিকে।

মহিম দেখল পাগলা গৌরাঙ্গের চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল।

মহিম ফিরে ফিরে দেখল সারা ঘরটা। কয়েক দিন মাত্র সে শুরু করেছিল পাগলা গৌরাঙ্গের আকণ্ঠ প্রতিমূর্তি, তা মাঝপথেই থেকে গেল।

ফিরে যাওয়ার পথে ট্রেনে উঠে মহিম কেঁদে ফেলল অহল্যার কাছে। পাগলা ঠাকুর কষ্ট পাবে বউদি।

অহল্যা মনে মনে বাঁকা ঠোঁটে হাসল। যার যেমন কর্ম তেমন ফল। কষ্ট অহল্যাও কম পায়নি।

এই হল মহিমের শিল্প চর্চা আরম্ভের প্রথম দিককার কথা। তারপর সে পাগলা গৌরাঙ্গের মূর্তি তৈরি করে রেখে দিয়েছে নিজের ঘরটিতে।

কয়েক বছর পরে পাগলা গৌরাঙ্গ ফিরে এসেছিল নয়নপুরে, কিন্তু কোন দিনও মহিমের সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা করতে গেলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

৩

জমিদার বাড়ীর সীমানায় পা দেওয়ার আগে থমকে দাঁড়াল মহিম, একটু দাঁড়াও পরানদা।

কি হল ?

সাঁকোটা বড় নড়বড়ে লাগছে। ভেঙে পড়বে না তো ?

পরান হেসে উঠল। অতবড় চেহারার মানুষটা, কিন্তু হাসির শব্দ যেন প্রেতের খিল্ খিল্ হাসির মত শোনাল। সরু মেয়েমানুষের গলার মত। হেসে বললে, এ মচ্‌কায়, তবু ভাঙে না মহিম।

সরু একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। অন্ধকারের মধ্যে ছম্‌ছমানি এনে দিয়েছে সেই একফালি চাঁদের ক্ষীণ আলো। পূবদিকটুকু ব্যতীত চারদিকে জলে ঘেরা, দীর্ঘ প্রাচীর ঘেরা বিরাট জমিদার বাড়ীটি যেন মস্ত এক প্রেত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন জানালা দরজা জাফ্‌রি ভেদ করে এক ফোঁটা আলোর রেশ পড়ে না চোখে।

বাড়ীটি সত্যই অদ্ভুত। পূবদিক ব্যতীত বাড়ীটির আর তিনদিকেই অর্ধ-বৃত্তাকারে একটি দীঘি, তার বুকে কালো জল হাওয়ায় ঢেউ খেলছে। এ দীঘি কাটতে হয়নি। নয়নপুর খালেরই কোন এক ফ্যাক্‌ড়া এককালে প্রবাহিত ছিল এখান দিয়ে। কালক্রমে তা মজে যায়। কিন্তু এ অর্ধবৃত্তাকার জায়গাটুকু আর মজেনি। সে অনেককাল আগের কথা। তখনও এই বসু বংশ ছিল না জমিদার, ওঠেনি এই চৌমহলার ইমারত।

কিন্তু যেদিন ইমারত উঠল, সেদিন এই দীঘি দেখে বোসেরা খুশিই

হয়েছিলেন। বাড়ী নয়, যেন প্রাচীনকালের দুর্গ, এই বড় দীঘি তাদের প্রহরী। চারিদিক বাঁধিয়ে বাঁধ দিয়ে, জমি উঁচু করে বাড়ি উঠল, সেই সঙ্গে তিন দিকে তিনটি ছোটখাটো সাঁকোও তৈরি করে দিয়েছিল তারা। অপরের জন্য নয়, নিজেদের দরকারের জন্যই। শুধু তাই নয়, কঠিন নিষেধ ছিল—সর্বসাধারণের প্রতি এ সাঁকোতে পা না দিতে। দেয়ওনি অবশ্য কেউ, নিতান্ত ক্ষেপে যাওয়া নয়নপুরের শতাব্দীর ইতিহাসে কয়েকবার ছাড়া। তখন ক্ষিপ্ত নয়নপুরের প্রতিটি আক্রমণের কেন্দ্র-স্থল ছিল এই প্রাসাদ। তা ছাড়া, আমলা-কামলারাও তো যাতায়াত করেছে সারাদিনই। তখন ছিল নবাবী ইতিহাসের জের, বাসি দাগ, আর নতুন বিজেতা ইংরেজের প্রখর কিরণ। আলো জ্বলত প্রতিটি গবাক্ষে দরজায়, কোলাহল ছিল প্রচুর, মারধোর, হাসি-হল্লা, গান, আর্তনাদ। সে সব অনেক কিছুই চাপা পড়ে গেছে। কারণ আর কিছু নয়। কালক্রমে বোস বংশ বাড়েনি, কমেছে আর যুগের মহিমায় রাজধানীবাসীও হয়ে পড়েছেন। জমিদারী প্রতাপ মরে যায়নি, কিন্তু মার্জিত ভদ্রলোক হয়েছেন বোসেরা।

সাঁকো পেরিয়ে পাচিলের গায়ে ছোট্ট দরজা দিয়ে পরানের সঙ্গে মহিম ঢুকল। ঢুকে পরান দরজাটা দিল বন্ধ করে।

মহিমের মনে হল এমন জায়গায় সে ঢুকল, যেখান থেকে নিজের ইচ্ছায় সে বেরুতে পারবে না কোন দিন।

বাইরের মহলে আলো জ্বলছে মাঝের গলি-পথের দু'পাশের দুটি ঘরে। পরান না দাঁড়িয়ে মহিমকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে চলল। প্রথম মহল পেরিয়ে বিরাট চত্বর। চত্বরের অপর দিকের মহলের সামনের ঘরগুলো অন্ধকার। নিঃশব্দ, কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব যেন টের পাওয়া যায়।

তীব্র সুগন্ধি ওল্কড়া তামাকের গন্ধে দ্বিতীয় মহলের চত্বরটুকু ভরে উঠেছে। তা ছাড়া, সুখাদ্যের গন্ধও তার ফাঁকে ফাঁকে এসে লাগছে নাকে।

নীরন্ধ্র অন্ধকারে পরানের গতি-পথ ঠিক করতে না পেরে মহিম দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল ডাকবে পরানকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি মিষ্টি মেয়েলী গলার চাপা উচ্ছ্বসিত হাসিতে থমকে গেল সে। আশে-পাশে ফিরে দেখল মহিম, কেউ নেই। উপরের দিকে তাকাল, অন্ধকারে মাথা উঁচুনো নিস্তব্ধ কালো ইমারত।

কানের পাশ দিয়ে পিঠের শিরদাঁড়া পর্যন্ত কে যেন ফুটন্ত কাশফুলের ডগা বুলিয়ে দিল মহিমের। ভয়ে কৌতূহলে ডাকতে ভুলে গেল সে পরানকে। কিন্তু হাসি আর শোনা গেল না। আশ্চর্য, ভয় পেয়েও মহিম আবার সেই হাসি শোনবার জন্য আকুল প্রতীক্ষা করছিল।

কই গো, আস। অন্ধকার ফুঁড়ে পরান আবার দেখা দিল।

এই যে, তোমাকে হারিয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে আছি। বলে সে আবার পরানকে অনুসরণ করল। তার মনে হল, বাড়ীটাতে পা দিয়ে পরানও যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

এবার আলো দেখা গেল কয়েকটা ঘরে। একটা ঘর থেকে পাতলা ধোঁয়ার আভাসেই মহিম টের পেল—তামাক-সেবীর সন্ধান। সেই ঘরটাতেই পরান তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল।

প্রকাণ্ড ঘর। বিচিত্র সব শৌখিন সামগ্রীতে ঘরটি ঠাসা। একটা পেলব শুভ্র বিছানা—সুন্দর একটি প্রাচীন পালঙ্কের উপর বিছানো। বিছানার শিয়রের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মহিম। আকণ্ঠ একটি বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি, পালঙ্কের গা ঘেঁষে বিচিত্র খোদাই কাঠের উপর মূর্তিটি বসানো।

পালঙ্কের পাশেই একটি আধুনিক সোফায়, আহ্বায়ক কর্তা বসে বসে গড়গড়া টানছেন।

পরান নিশ্চল, কি যেন ইশারা করতে চাইল মহিমকে। মহিম ফিরেও দেখল না সেই দিকে। সে একবার বুদ্ধমূর্তি আর একবার কর্তাকে দেখতে লাগল। কোথাও অন্য কোনও ব্যতিক্রম তার চোখে পড়ল না। কিন্তু সে তো জানে না, কত বড় একটা ব্যতিক্রম থেকে যাচ্ছে। জানতে পারলে বুঝি এই পুরনো বাড়ীটার খিলান প্রাচীরেরই একটা গর্জন শুনতে পেত।

তবু, প্রণাম তো দূরের কথা, একটা সামান্য নমস্কারের কথা পর্যন্ত মনে এল না মহিমের।

এবার ঝিমুনি কাটিয়ে হঠাৎ মুখের থেকে নলটা সরিয়ে হেমচন্দ্র তাকালেন মহিমের দিকে।

পরান বলল, দাশু মণ্ডলের ছেলে, মহিম।

ও! খুবই যেন শিষ্টাচারের সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলেন হেমবাবু। কোন রহস্য নেই, খিঁচ নেই, স্বাভাবিক সাধারণ ভদ্রলোকের মত তিনি বললেন, ও, মহিম বুঝি তোমারই নাম? এস এস, বস। পাশের একটি সোফা তিনি দেখিয়ে দিলেন মহিমকে।

মহিমেরও যেন আচমকা এতক্ষণে ঘোর কাটল। জাতপ্রথাগুলো মনে পড়ল তার। তাড়াতাড়ি একটি প্রণাম করে সোফাটাতে বসল সে।

শংকিত দেখাল শুধু পরানের চোখ।

মহিম লজ্জা পেয়েছে। কিছুক্ষণ আগে—যে হাসি তার মনে এক রহস্যের সৃষ্টি করেছিল, যে ভাবগাম্ভীর্য এনে দিয়েছিল তাকে এই বাড়ী আর তার আবহাওয়া, তা কেটে উঠতে লাগল। কোন দিনের তরে এ বাড়ীতে না ঢুকলেও মহিম বাইরে থেকে দেখে দেখে বাড়ীটার ভিতরটুকু

যেন এমনি ভাবে মনে মনে এঁকে রেখেছিল। এমন কিছু নতুন মনে হল না তার, শুধু নিস্তব্ধতা আর ওই হাসিটুকু ছাড়া।

এবার সে স্পষ্টই দেখল, মূর্তিটা যেন তার খুবই পরিচিত, ইচ্ছে করল, মূর্তিটার পেছনে শিল্পীর নামটা সে ছুটে দেখে আসে।

তাকে বার বার ওদিকে তাকাতে দেখে হেমবাবুই বললেন, কলকাতায় থাকতে তুমি ওই মূর্তি গড়েছিলে। আমাকে দিয়েছে গৌরাঙ্গসুন্দর। আমাকে দিয়েছে বললে ভুল হবে, আমার বউমা'কে দিয়েছে। আমার বউমা'র সঙ্গে কলেজে পড়ত গৌরাঙ্গ কলকাতায়। বলে তিনি হাসলেন মহিমের দিকে চেয়ে।

গৌরাঙ্গের সহপাঠিনীর অস্তিত্ব এ বাড়ীতে আছে জেনে—আবার ঝাপ্‌সা হয়ে এল মহিমের এ বাড়ী সম্বন্ধে ধারণা।

এই পরিবেশের মধ্যে কলকাতার কলেজে-পড়া মেয়ের আবির্ভাব বিস্ময়েরই কথা। অবশ্য বিস্ময় লাগে না জমিদারীর স্বৈরতান্ত্রিক সুরের বদলে হেমবাবুর নিছক ভদ্রলোকের মত অমায়িক কথা শুনলে।

মহিম বুঝল, এ স্থবির ইমারতের, আর তার ভিতরের আসবাব সামগ্রীর চেয়েও তাড়াতাড়ি যুগ এগিয়ে চলেছে। যার আবর্তে, চোখে ঠেকবার মত না হলেও বোসেদের পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রাসাদ প্রাণহীন, মানুষকে তার আবহাওয়া দিয়ে ঘিরে রাখতে চাইলেও অতীত স্থবির স্বৈরতান্ত্রিক দানবটার সে ক্ষমতা নেই। যদি থেকে থাকে তবে, তাকে নতুন খোলাস নিশ্চয়ই আত্মগোপন করতে হয়েছে।

হেমবাবু আবার বললেন, সত্যি, বাংলাদেশের চাষীদের যে সমাজ-ব্যবস্থা, তার মধ্যে তোমার এ আত্মপ্রকাশ একটা বিস্ময়েরই কথা। আশ্চর্য, চাষীর ঘরের ছেলে তুমি!

এতক্ষণে মহিম বুঝতে পারে ভাল করে সে কোথায় এসেছে। ওই

চাষীর ঘর কথাটিতেই অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে দেখা দিল, এমন কি, সোফাটাতে বসা পর্যন্ত তার কাছে আর স্বাভাবিক ঠেকল না। প্রশংসা নিঃসন্দেহে, করুণা মিশ্রিত। অবজ্ঞা করতে পারলেই যেন ভাল হত হেমবাবুর পক্ষে।

ব্যাপারটা কিন্তু পূর্ব জন্মের, যাই বল? প্রতিভা নিয়েই জন্মেছ তুমি। তিনি বিশ্বাস করেন, জন্মক্ষণের আর গ্রহ-নক্ষত্রের কোন এক বিচিত্র মিলনেই প্রতিভাবানরা জন্মান।

কিন্তু মহিমের মনে পড়ল পাগলা গৌরাঙ্গের একটি কথা যে, প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না। যার যে বিষয়ে অনুরাগ, মানুষ যদি তার সেই অনুরাগের মূলটিকে দিনের পর দিন হৃদয় নিংড়ানো রস দিয়ে তাকে সজীব না করে তোলে, যদি বাড়িয়ে না দেয় ডালপালা আর অজস্র পত্রপল্লবে, যা দেখে আমরা বলব প্রতিভার বিকাশ; তবে তা দুদিনেই মরে পচে হেজে যাবে। তুমি শিল্পী হবে, এ নির্দেশ আছে তোমার অন্তরে। সে নির্দেশ মেনে যদি কাজ না কর, 'ইচ্ছা' বলে বস্তুটা তখন খালধারের মাঠে হুঁকো নিয়ে বসার তাগিদে জমে যাবে। ঈশ্বরদত্ত বস্তুর কোন স্থান নেই এখানে।

পাগলা গৌরাঙ্গ আর হেমবাবুর কোন কথারই মূল্য কম নয় মহিমের কাছে, কারণ হেমবাবুর কথার মধ্যে তবু তার মনে গেড়ে বসা অনিচ্ছাকৃত সংস্কারগুলোর সমর্থন আছে—তাই এটাকেও সে একেবারে মূল্যহীন বলতে পারে না। আবার পাগলা গৌরাঙ্গের কথায় আজন্ম-লালিত তার সংস্কার এমন আঘাত পায় যে, সে পুরোপুরি সেই মতবাদের দড়িটাতে দৃঢ় হয়ে ঝুলে পড়তে পারছে না। পথ তার সামনে রয়েছে, মনটা ঠিক হয়নি।

তাই হেমবাবুর কথায় সে প্রতিবাদও করল না, তর্কও জুড়ল না। সে রকম অভ্যাসও তার নেই।

হেমবাবু কথায় কথায় নিজের কথায় চলে এলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি ভুলে গেছেন, কথা বলছেন তিনি দাশু মোড়লের ছেলের সঙ্গে, তাঁরই নগণ্য এক প্রজার সঙ্গে। কিংবা এ শুধুই তাঁর নিজের পরিচয় দানের ভূমিকা।

বিস্ময়ের ঘোর রইল শুধু পরানের চোখে। এমনটা সে আশা করতে পারেনি; এমনি করে মহিমের কাছে কর্তা তাঁর নিজের জীবন-প্রসঙ্গ পেড়ে বসবে, নিজের লোকের মত। আশ্চর্য, উৎসাহও তো কম নয় বলার, আর বেশ গভীরভাবেই বলছেন।

মহিম ভাবল অনেক রকমের পরিচিত লোকের মধ্যে হেমবাবু একটা রকমই। তবু তার কাছে এটা আকস্মিক বই-কি। নয়নপুরের বোসদের অন্দরমহলের ঘরে বসে কর্তা বলছেন তাঁর জীবনকাহিনী, এক অর্বাচীন চাষার ছেলের কাছে—এ কি বিস্ময়ের নয়? ব্যাপারটা এমনি আচমকা ঘটছে যে, পরান তাদের বাড়ি যাওয়ার আগের মুহূর্তেও যে ভাবতে পারেনি—এখানে সে আসবে, আর হেমবাবু কথা বলার আগে এও বুঝতে পারেনি—বোসেদের প্রসঙ্গে এমন করে বসিয়ে কেউ তাকে বলবে।

হেমবাবু তখন বলছেন, আমি অবজ্ঞা করতে চাই না মানুষকে, তা সে তুমি যে-ই হও। যতক্ষণ পর্যন্ত না টের পাচ্ছি তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষী, ততক্ষণ তোমাকে আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করব। তার মানে এ নয়—আমার দোষসমালোচনা করলেই সে আমার অশুভাকাঙ্ক্ষী হবে।

তাই একদিন আমি আমাদের এই সমস্ত বংশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম, এদের কাজ, কথা, চরিত্র, ব্যবহার—সমস্ত কিছু আমাকে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এ আকাশস্পর্শী ইমারত—এটাই যেন

সত্য, এ স্থবির দানবটা যেন আমাকে সর্বদাই বলত—তুমি আমার তাঁবেদার কি রকম ? আমি কি স্থবির ? ইমারত আমাকে শাসন করবে ? সমস্ত কিছুর বাধা ঠেলে একদিন বেরিয়ে পড়লাম—এ বাড়ি আর তার বেষ্টনী ছেড়ে। কিন্তু শান্তি কোথায় ? বোসবাড়ির সেই স্থবির দানবটাই আমার পেছনে পেছনে তাড়া করে চলেছে। আমাকে পেছন থেকে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করেছে। 'টাগ্ অফ ওয়ার' যাকে বলে। আমিও টানি, ও-ও টানে।

তারপর ঝাঁপ দিলাম গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। সে হল আমার কলুষ দেহটাকে পবিত্র জলে ধুয়ে নেওয়া। চোখের জলও সেদিন কম ছিল না। জেলে গেলাম। জেল থেকে বেরিয়ে নয়নপুরে এলাম। এখানেও চোখে পড়ল পরিবর্তন। জোয়ার সর্বত্র। উদ্দীপনা পেলাম। দেখলাম—বোসবাড়ির পরিবর্তন হয়েছে। মড়ক এসেছিল কি না জানি না—দেখলাম অনেকেরই নেই পাত্তা। আর বড় শান্ত সৌম্য পরিবেশ। আমার স্ত্রীও মারা গেছেন। আছে শুধু দূর সম্পর্কের বোনের কাছে আমার একটি ছেলে, আর আমার বৃদ্ধ দাদা।

মহাত্মাজীর আদর্শে গড়লাম এ বাড়ির পরিবেশ। দেশী আর বিদেশী সব কাপড় বাতিল করে দিয়ে খাদির প্রতিষ্ঠা করলাম। তখনই তো স্থাপন করলাম তোমার এই অহিংসার দেবমুনির মূর্তি। যেদিন এ বাড়ির পরিবেশ ছেড়েছিলাম—সেদিনই আর্টের প্রতি আমার দরদ বাড়ে, বলে তিনি চুপ করলেন।

মহিম এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখল। সত্যাই, কাপড়-চোপড় সবই খদ্দরের। এমন কি, ঘরের পর্দা, সোফার রঙিন কাপড়গুলো পর্যন্ত।

হেমবাবু একটি শ্রদ্ধার আ নই পেলেন মহিমের মনে। কিন্তু পাগলা

গৌরাঙ্গ তার হৃদয়ের যে স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে এ আসন বড়ই টলমল।

কারণ পাগলা গৌরাঙ্গ, গান্ধীজীর প্রতি রুষ্ট, অত্যন্ত প্রখর ও কঠিন ভাষায় যে গান্ধীবাদকে আক্রমণ করে থাকে, যেখানে মহিম তার সমস্ত সত্তা হাতড়িয়েও একটা জবাব খুঁজে পায় না। গান্ধীজীর ভাগবত মাহাত্ম্যকে কি তীব্র আর করুণ ভাবেই না শ্লেষ করে থাকে। যা মহিমকে সময়ে রুষ্ট করলেও, উত্তেজিত করলেও পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতিটি যুক্তির ঝাপটায় তৃণবৎ উড়ে গেছে সে। সেই কিশোর বয়সে সে যে তর্ক করেছে, গান্ধীবাদের স্বপক্ষে আজ সুদীর্ঘ ছ' বছর পরেও সে নতুন কোন তীক্ষ্ণ যুক্তি শানাতে পারেনি।

এখানেও সেই একই কথা। এখনও সে মনস্থির করতে পারেনি। গান্ধীবাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, শুনলে ভক্তির উদ্রেক হয় হৃদয়ে। কিন্তু যখনই মনে পড়ে পাগলা গৌরাঙ্গের তীব্র গলার রূঢ় অথচ যুক্তিতে নিশ্ছিদ্র কথাগুলো, তখনই থেমে যায় সে আগে বাড়তে। সংশয় আসে মনে।

কিন্তু হেমবাবু ধরে নিয়েছেন, এতক্ষণে তিনি যত কথা বলেছেন, তার এক বর্ণও বোধ হয় মহিমের বোধগম্য হয়নি। এক পাগলা গৌরাঙ্গ আর কিছুটা অহল্যা ছাড়া, কেউই তো বুঝতে পারে না মহিমকে, কি তার চিন্তাধারা, কেমন করে সে ভাবে, আর কতখানি অগ্রগামী তার মন।

দাও মোড়লের এই রোগা শান্ত ছেলেটি যে 'দুনিয়া ডুবে যাক্' গোছের চিন্তাধারায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে, প্রতিটি পলে পলে, প্রতিটি ঘটনা চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে করে ভেবে ভেবে এমন একটা দীপ্ত মানবিকতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, একথা তো কেউ বুঝতেও চায়নি। এই ছেলেটির

চোখে যে পৃথিবী একটু আলাদা, না জানালে একথা জেনে নেবার সাধ কারুর হয়নি আজও।

হেমবাবু তাকে জানেন শিল্পী বলে। পটুয়া কুমোরের পরিমার্জিত সংস্করণ—যা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তার বেশি কিছু নয়। আবার এও তিনি জানেন, শিল্পধর্ম বজায় থাকলেই হল, তার বেশি কোন বেড়া ডিঙিয়ে শিল্পী কোন্ পথের শরিক হয়েছে, তা জানবার তাঁর কোন দরকার নেই, শিল্পীরও শিল্পরূপটুকু বজায় থাকলেই হল। শিল্পী—শিল্পী, তার বেশি কিছু নয়।

নে, পরান একটু তামাক খাওয়া। কথাটা বলতে বলতেই তাঁর আবার অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বললেন, ওহো, আর এক কথা তো ভুলেই গেছি। বউমাকে একটু ডেকে দে পরান।

পরান বেরিয়ে গেলে তিনি বললেন, এখন আমি আমার পরিবারটির জন্য সত্যই গর্বিত। ছেলে আমার বিলাতে, জানি না কি রকম হয়ে সে ফিরবে। কিন্তু আমার বউমাকে দেখলেই তুমি তা বুঝতে পারবে। তোমার ওই মূর্তি দেখে সে-ই প্রথম তোমাকে দেখতে চেয়েছিল, বাধ সেধেছিল গৌরাঙ্গসুন্দর। সে তোমার উপর বড় চটা হে, তোমার নাম করলেই ক্ষেপে যায়। অথচ তোমার কথা বলতে বলতে সে নিজে কর্তা-বাবার করে ফেলে, বলে তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

হাসতে পারল না মহিম। কিন্তু হেমবাবুর বউমার আসার কথাতে অস্বস্তি লাগল তার। কথা তো মহিম বলতে পারে না। না, কারুর সঙ্গে সে খুব সহজভাবে কথা বলতে পারে না, তার মধ্যে সে যদি হয় আবার অপরিচিত, তার উপর আবার শিক্ষিতা মহিলা।

হেমবাবুর বউমা এলেন—শ্রীমতী উমা।

পাড়াগেঁয়ে হলেও মহিমের শালীনতাবোধ কম নেই। তবু সে তাঁর

চোখ নামাতে পারল না উমার দিক থেকে। খুবই সহজ ও অনাড়ম্বর বেশে সে এল। একটি কালোপেড়ে খদ্দরের শাড়ীর সঙ্গে একটি শাদা জামা। দীর্ঘ সতেজ সবল দেহ, শান্ত, কিন্তু দীপ্ত মুখ। ঠোঁট দুখানিতে মমতার আভাস আছে, কিন্তু তা যেন নিয়ত কঠিন বিদ্রূপে বঙ্কিম।

এবার আর পরানকে ইশারা করবার চেষ্টা করতে হল না। মহিম নিজেই উঠে উমাকে প্রণাম করতে গেল।

উমা বালিকার মতই হেসে উঠে, দু'হাতে মহিমের হাতটা জড়িয়ে ধরল,—ছি ছি, একি করছেন ?

উমা টের পেল, মহিমের হাত কাঁপছে, হয় তো বা সর্বাঙ্গটাই। মনে মনে হেসে হাতটা ছেড়ে দিল সে।

হেমবাবু হেসে উঠলেন। এখানে ছোটবড়র কথা নেই কিনা। ওরা যে তোমার প্রজা।

বলে তিনি আবার হাসলেন। বললেন, আমাদের হিরণ মহিমের থেকে কয়েক বছরের বড়ই হবে। তোমারই সমবয়সী হবে হয়ত মহিম। হিরণ তাঁর ছেলে, উমার স্বামী।

সে কথার কোন জবাব পেলেন না তিনি। উমা তখন বিস্মিত চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে শিল্পীকে। খুবই ছেলেমানুষ বলে মনে হল তার, আর বড় কোমল। কিন্তু দেহের কোন ভঙ্গিটাতে যে দৃঢ়তা ফুটে রয়েছে টের না পেলেও সে বুঝল শিল্পীর হৃদয়ে আছে একটা কঠিন দিক, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে সতেজ।

আর মহিম অন্য দিকে ফিরে যত চেষ্টা করল, যে মহিলাটি বিস্মিত প্রশংসায় তাকে নিরীক্ষণ করছে তার মুখটা মনে আনতে, ততই তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল এ ঘরের ওই বুদ্ধ মূর্তিটার মুখ। কেন ? কোন মিল কি সে খুঁজে পেয়েছে উমার মুখটার সঙ্গে ওই মূর্তিটার ?

ভেবেছিলাম, না জানি কতবড় আপনি। উমা বলল, গৌরাঙ্গবাবুর ওখানে আপনার গড়া সব নিদর্শনগুলোই দেখে এসেছি। সত্যি, আপনি যদি কলকাতায় থাকতেন, আপনার প্রতিভা আজ জগতের একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠত।

উত্তরে মহিম হাসল। লজ্জা ও সংকোচের হাসি। আর ভাবতে লাগল উমার কথাগুলো, ভদ্র মার্জিত স্পষ্ট কথা, যে কথাবার্তার সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবনের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। কিন্তু জমিদারের পুত্রবধূর আভিজাত্যের অহমিকা কোথাও ফুটে উঠতে দেখল না। সহজ প্রশংসা, অনাড়ম্বর গুণগান। তবু কোথায় যেন মহিমের মনে একটু খটকা থেকে যাচ্ছে। তা বোধ হয় ওই মমতা মাখানো ঠোঁট দু'খানির বিদ্রূপাত্মক বঙ্কিম রেখাটি মনে করে।

গৌরাঙ্গবাবুর কাছে শুনেছি আপনার সব কথা; উমা তার শ্বশুরের পাশটিতে বসে বলল, তবু আপনার কাছ থেকেও শুনব আপনার কথা।

মহিম চকিতের জন্য তুলে ধরল তার সংশয়ান্বিত কোমল চোখ দুটো উমার দিকে। কি কথা শুনতে চায় উমা! বলবার মত কিছু তো তার নেই, বিশেষ করে বাংলার সেরা জায়গারই এক বিদুষী মহিলার কাছে!

উমা যেন স্পষ্টই বুঝতে পারল মহিমের মনের কথা। তাই সে আবার বলল, শুনব, কেমন করে এ পথে এলেন আপনি। তখনকার যে বিচিত্র মানসিক দৃঢ়তা ভাব জ্ঞান আপনাকে এ পথে আসতে সাহায্য করেছে, তখনকার আপনার প্রতিদিনের মনের প্রতিটি সংশয় আশা ওঠা-নামা, তারই গল্প। সত্যি, যারা শিল্পী, তাদের আমি মনে করি যাদুকর। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া মানুষ, যাদের কোন কিছুরই সঙ্গে বুঝি আমাদের মিল নেই।

মহিমের মধ্যেকার গভীর শিল্পীটি, বিনম্র হাসিতে মাথা পেতে নিল

উমার কথার মধ্যেকার বিস্মিত শ্রদ্ধাটুকু। জানবার আগ্রহটা উমার খুবই প্রবল, কথাগুলো কিন্তু হালকা। কারণ শিল্পীদের সে অন্য জগতের মানুষ বলে ধরে নিয়েছে। তার কিশোর বয়সের সাধনার কথা জানতে চাইল, কিন্তু সাধক বলতে পারল না।

সহস্র সংকোচ মহিমকে এমন আবিষ্ট করে রাখল, শব্দ বেরুল না গলা দিয়ে পর্যন্ত একটা। নীরবতার তিক্ততার চেয়েও সব কিছুকেই এক অদ্ভুত সংকোচের হাসি দিয়ে নেওয়াকে মোটেই অস্বাভাবিকও ঠেকল না। হেমবাবু আর উমার কাছে তো নয়ই, মহিমের কাছেও নয়।

হেমবাবু উমার প্রতি কয়েকবার ঘন ঘন চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর মনের কোথায় যেন একটু ক্ষোভ মিশ্রিত বিস্ময়ের আঁচ লেগেছে। তা বোধ হয় উমার এ আত্মভোলা বিমুগ্ধতার রূপ দেখে। কারণ এমনটি তিনি আর কখনও দেখেছেন বলে তাঁর মনে পড়ল না, বিশেষ উমার মত মেয়ের এ আত্মভোলা রূপ। আর এও তিনি জানেন, এমনি বিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন নীরব বিস্মিত প্রশংসায় ব্যাকুল, (হ্যাঁ, ব্যাকুলই মনে হল তাঁর) এমন অবস্থা মানুষের জীবনে তো খুব কমই আসে। তাঁর মনে হল, এ যেন খানিকটা ভক্তের ভগবান দর্শনের মত।

উমার বোধ করি তখনও শিল্পীকে দেখা শেষ হয়নি। সে তখনও শিল্পীকে দেখছে। চোখটা সেইদিকেই, কিন্তু মনটা যে তার সেইখানেই —এমন মনে হল না। কারণ চোখে চকিতে আলোছায়ার খেলা— তার মনের প্রতিবিম্ব।

আবার মহিম সেদিকে না তাকিয়েও অনুভব করল, তার প্রতিটি লোমকূপে ওই বিমুগ্ধ দৃষ্টি যেন বিদ্ধ হচ্ছে। অবস্থাটা তার অত্যন্ত কঠিন মনে হল। এই সঙ্গে তার মনে পড়ল পাগলা গৌরাঙ্গের মুখটা, তার

সেই বিস্মিত চোখ। যা দিয়ে সে পাগলের মত দেখত মহিমকে, আর বুকে জড়িয়ে ধরে বলত, হবে—তোমার দ্বারা হবে।

ক্ষণিকের এ স্তব্ধতা অস্বাভাবিক লাগল হেমবাবু আর মহিমের কাছে।

হেমবাবু বললেন, যাক্, এখন বল তো, বর্তমানে কি করছ তুমি? কোন কাজ-টাজ হাতে নিয়েছ নাকি?

মহিম বলল, হ্যাঁ, আরম্ভ করেছি একটা।

কি, বল তো?

এক কথায়ই জবাব দিতে পারল না মহিম। একটু হেসে মাথা নোয়াল সে।

বলুন না। প্রশ্নটা যেন উমাই করেছে, এমনভাবে কথাটা বলল সে।

শিব আর সতীর। চোখের মধ্যে স্বপ্নের ছায়া নামল মহিমের। খানিকটা আপন মনেই বলে চলল সে, সেই ক্ষ্যাপা শিব যখন মৃতা সতীকে দাহ করতে চলেছে কাঁধে সতীকে নিয়ে—সেই মূর্তি।

অপূর্ব! বিস্মিত উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন হেমবাবু।

সামনের বড় টেবিল ল্যাম্পটার উজ্জ্বল নীরব শিখার মত দীপ্ত কম্পিত মনে হল উমাকে। কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

আবার খানিকক্ষণ নীরবতায় সকলেই যেন অনুভব করল—এই মুহূর্তের গম্ভীর সুন্দর রূপটুকু।

তোমার একটা মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতিমূর্তি কিন্তু করা উচিত। ভারতের মহামানব তো তিনি! শ্রদ্ধায় ধ্যানস্থ মনে হল হেমবাবুর চোখ দুটো। তাঁরও একটা আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় ও সততার মানসিক চিন্তার শৌর্যতায় ভরা দিক আছে, যেদিকটাকে তিনি মনে করেন আনন্দ ও বলিষ্ঠ আদর্শে মহীয়ান, যার ভাব-গাম্ভীর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে।

মহিম বলল, ভেবেছি অনেকবার, কিন্তু হয়ে ওঠেনি আজও।

কিন্তু সে বলতে পারল না, সমস্ত কিছুর মূলেই যে অনুপ্রেরণা বোধ তার থাকে, সে অনুপ্রেরণা সে পায়নি। কথাটা বলে সে একবার তাকাল উমার দিকে। চমকে উঠল সে। মনে হল তার সামনে বুঝি পাগলা গৌরাঙ্গ বসে আছে, এমনিই কঠিন দৃষ্টি উমার। আর কি নির্মম শ্লেষে বেঁকে উঠেছে তার ঠোঁট দুটো। পাশাপাশি হেমবাবু আর উমার মুখের পার্থক্য যেন অবিশ্বাস্য মনে হল তার।

আমিও আপনাকে একটা অনুরোধ করব কিন্তু। আবার সহজ-ভাবে হেসে বলল উমা।

নিঃশব্দে মহিম তাকাল উমার দিকে।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন আপনি?

আঘাত পেল মহিম, তৎসঙ্গে ক্ষোভ। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করল না। কেবল ভাবল, শহরের এ বিদুষী মহিলা তাকে কতখানি অর্বাচীন ভেবেছে! অবশ্য তাকে বেশি দোষী করার অধিকার নেই, কারণ এটা যে নয়নপুর, বাংলা দেশের লক্ষ গ্রামের একটি মাত্র। আর তারই এক অন্ধ বাসিন্দা মহিম। সত্যই, নয়নপুরের তাদের মত মানুষ, যাদের সংখ্যাই নয়নপুরে বেশি, তাদের ক'জন জানে রবীন্দ্রনাথের নাম? আর পাগলা গৌরাঙ্গের বন্ধুত্বের প্রথম দিনটি থেকে, সে কত জেনেছে, শিখেছে ভাবতে, তাই বা ইনি জানবেন কি করে?

কিন্তু সে ঘাড় কাৎ করার আগেই উমা বলল, শুনেছেন নিশ্চয়ই। সেই কবির একখানি মূর্তি কিন্তু আপনার গড়া উচিত। বিশ্বকবি তিনি।

কথাটা আগে কখনো মনে হয়নি। উমার মুখ থেকে শুনে মনে হল, সত্যই, তার শিল্প-চর্চায় একটা ফাঁকই থেকে গেছে। কবি যে সত্যই তার বড় শ্রদ্ধার আর প্রিয়পাত্র, যাঁর মানবিকতা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে

হেমবাবু আর উমা, দু'জনের কথাতেই সে সায় দিল। কেন যেন তার মনে হল, একই বাড়ীতে এই দুটি মানুষ একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। এদের কথায় এবং ব্যবহারে—তফাৎটাই সে আজ দেখল। শুধু তাই নয়, তার মনে হল, এ দুটো মানুষের যে চারিত্রিক প্রভাব আছে, তা দিয়ে দু'জনেই যেন খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে প্রভাবান্বিত করতে চাইছে মহিমকে।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, যেজন্য তোমাকে ডেকেছি। এতক্ষণ পরে কথাবার্তার সুরে এবং চেহারায় একটু বৈষয়িক হয়ে উঠলেন হেমবাবু। বললেন, পুজো তো এগিয়ে এল, এবার আমাদের প্রতিমার ভারটা তুমিই নেও না।

মহিম খানিকটা সংকোচের সঙ্গেই এ অনুরোধ অস্বীকার করল। বলল, সে সময়ও তো নাই, আর অতবড় কাজ আমি করতেও পারি না।

হেমবাবু অসন্তুষ্ট হওয়ার বদলে হেসে উঠলেন। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু একেবারে নিরাশ করলে চলবে না। আসছে বছর তোমাকেই করতে হবে। এবারও পরিকল্পনাটা তুমিই দাও।

মহিম হাসল। বলল, আমি এবার তা হলে যাই?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত হল অনেক। পরান, একে একটা আলো দেখা।

মহিম প্রণাম করল হেমবাবুকে, তৎসঙ্গে উমাকেও।

আশ্চর্য! উমা এবার আপত্তি করল না। কি যেন বলতে চাইল, তাও পারল না। একটু পরে বলল, ডাকলে কিন্তু আবার আসবেন।

৪

বাড়ীর বাইরে সাঁকোটা পেরিয়ে হঠাৎ পরান বলে উঠল, ভাবখানা মোরে তাজ্জব করলে। তোমারে ডাকতে যাওয়ার আগে কর্তা বললে, 'দশ-রথের ছেলে সেই কুমোরকে একটু ডেকে নিয়ে আয়।'

মহিম আশ্চর্য হল না। কিন্তু পরানের বিরক্তি দেখে সে বিস্মিত হল। বিরক্তি নয়, পরানের কথার মধ্যে কর্তার বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ রয়েছে; পরানের জীবনে এটা নতুন কি না জানা নেই, মহিমের কানে এটা নতুন।

আর কিছু না বলে পরান ফিরল।

আকাশের একফালি চাঁদ ডুবেছে অনেকক্ষণ। জমাট অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগে বোধ হয় সামান্য জল হয়ে গেছে। মহিম টের পায়নি। দীঘির কালো জলে নক্ষত্রের ঝাপসা রেখা দুলছে।

মনে পড়ল গোবিন্দের কাছে একবার যাওয়ার কথা। দৈনন্দিন আড্ডাস্থল সেটা মহিমের। ভক্ত গোবিন্দ। ভক্ত বললে বোধ হয় ভুল হবে, সাধক গোবিন্দ।

অন্ধকার, কিন্তু পথ জানা। মহিম এগুলো। কয়েক পা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

সামনে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়েই মহিম অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি ভরত।

অ। তা—তুমি—

তা না এসে উপায় আছে নাকি আর কিছু। ভরত বলে উঠল, বকে তো থির হয়ে মোর দু' দণ্ড বসবার জো নাই। তা-কি, বিত্তান্তটা কি এতক্ষণ বাবুদের বাড়ীতে?

মহিম বুঝল রাগটা ভরতের অহল্যার উপর। সে-ই তাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে এখানে পাঠিয়েছে, কিন্তু কি কথা এতক্ষণ হল, কি বলবে সে ভরতকে। মহিমের কাজকে ভরত বলে, বনের মোষ তাড়ানোর কাজ। কথাকে বলে, ফষ্টিনষ্টির বড় বড় কতা। আবার এ-ও ঠিক, এই ভাইটির জন্য গাঁয়ে ঘরে তার ঢাক পেটানো গলাবাজিও কম নেই, নেই গৌরব-বোধেরও কম। সামনে যা-ই হোক, আড়ালে মনের মধ্যে তার কোথায় যেন অনেকখানি শ্রদ্ধা এই ভাইটির জন্য সঞ্চিত আছে। আছে বিস্মিত ভালবাসা।

মহিম বলল, ওই হল নানান কথা। বাজে কথা সব।

মহিমও বলে বাজে কথা। ভরত বোঝে, এ হল তার মন যোগানোর আড়ে, তাকেই ঠাট্টা করা। আসলে তার ভাইয়ের কাছে যে সে সব কথা মোটেই বাজে নয়, সে কথা বোঝবার মত বয়সের মিন্সে সে হয়েছে। মণে মণে বলে, ছোঁড়া যদি এট্টু খাতির করত। তা নয়, বলেছি বলে কেমন খোঁচাটা দিল।

বাজে নয় তো কি, কাজের কথা নাকি? গম্ভীরভাবে বলে ভরত।

অবাক করলে। আমিও তো তাই বলছি। অন্ধকারে মহিমের হাসি দেখতে পেল না ভরত।

বলবিই তো।

কিন্তু ভরতের মনে প্রবল কৌতূহল, কি এতক্ষণ ঘটল জমিদার বাড়ীতে। না শুনলে তার পেটের ভাত হজম না হয়ে অস্বস্তি বাড়বে আর ছটফটানিতে কাটবে। তা ছাড়া, অনেক মানুষ যেমন আছে,

কথাটি শুনেছ তো অমনি চাউর কর, ভরত খানিকটা সেই রকম। কথা সে যাই হোক, সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের মতটি করে নিয়ে চালু করবে সে। কৌতূহল ভরতের সেইখানেই বেশি, যখনই মনে হচ্ছে, কথাটা নিয়ে গাঁয়ে-ঘরে ঘুরে বেড়ান যাবে খুব। আর সে রকম কথা হলে বুক ঠোকার বাহাদুরিটাও পাওয়া যাবে কম নয়।

বলছি এতখোন ধরে কথাটা কি হল? বলে দাঁড়িয়ে আছি তো সেই ক' দণ্ডকাল ধরে। তারও খানিকটা উৎকণ্ঠা এসে পড়েছে মনে।

মহিমও বুঝল, মুখে যতই নীরস হোক, ভরতের মনে আছে উৎকণ্ঠিত ছটফটানি।

উৎকণ্ঠারই ব্যাপার। যাদের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে শুধু অপমান, উৎপীড়ন, যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে অত্যন্ত তিক্ত, তাদেরই এ আকস্মিক ডাক কেন? প্রশ্নটা বিস্মিত এবং উৎকণ্ঠিত। নয়নপুরের কত মানুষের ডাক পড়েছে এমনি অতীতে কতদিন। এখন গল্প হলেও শোনা গেছে, সে ডাকে হাজিরা দিতে গিয়ে জোয়ান মদ্দরা অনেকে ফিরেও আসত না। যদি বা আসত, কথায় বলে 'বাঁশডলার' রক্তাক্ত দেহে নিয়ে নিজের দাওয়াটিতে এসে চিরদিনের মত চোখ বুজত। নয়নপুরের ওই প্রাসাদ, নয়নপুরের শতাব্দীর কোটি প্রশ্নের জবাবে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের কাছে জিজ্ঞাসা। পাথর কোন দিন কথা বলেনি। ওই মৌন প্রাসাদ নয়নপুরের কাছে আজও বিভীষিকায়, লোভে, হাসি-কান্নায় এক বিচিত্র রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে। ওই প্রাসাদের মানুষের পরিবর্তন আজকাল চোখে পড়ে, প্রাসাদটার পরিবর্তন চোখে পড়েনি কোনদিন, মানুষের নীরব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি আজও।

শ্মশান পবিত্র, কিন্তু শ্মশানের আতঙ্ক কি দুর্নিবার! যেন কোন্ বিভীষণ রহস্যে ভরা, কণ্টকিত ভাবনায় মূঢ় করে দেয়, এনে দেয় আড়ষ্টতা।

ভরত উৎকণ্ঠিত হবে ব-ই কি! নয়নপুরের মাটিতে যার জন্ম, নয়নপুরের ওই প্রাসাদ তো এক বিশিষ্টতা নিয়ে আছে তারও মনে। তার রক্তের ধারায় মিশে আছে ওই প্রাসাদের কথা, ওই রূপ। কোন দিন যেখানে ডাক পড়েনি, না পড়াটাকেই সৌভাগ্যের কথা বলে জেনে এসেছে, সেখানেই ঘরের মানুষ প্রহর কাটিয়ে এল। উৎকণ্ঠা হবে না ভরতের? অহল্যার মুখে এ কথা শুনে প্রথমেই তার মনে যে উৎকণ্ঠা এসেছিল, তা-ই শেষটায় ক্রোধে পরিণত হয়েছিল তার। পরানের কথায় বিশ্বাস কেন করেছিল অহল্যা, আর মহিমই বা এক কথায় রাজী হয়েছিল কেন? জীবনে যাদের সঙ্গে কোন দিন খাজনা, আর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কারবার নেই, যাদের আহ্বানকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখে, যেখানে লোকে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় মনে করে—অমঙ্গলকর কিছু ঘটতে পারে বলে, সেখানে এ ভর সন্ধ্যেবেলা ডাক পড়ার কি কারণ থাকতে পারে?

নয়নপুরের মানুষ মহিমও। তাই তো তার বোসেদের সাঁকো পেরিয়ে পাচিলের আড়ালে গিয়েই মনে হয়েছিল, যেখানে সে এল, সেখান থেকে নিজের ইচ্ছায় বুঝি আর কোন দিন বেরুতে পারবে না। তাই তো তার সেই দ্বিতীয় মহলের অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষের হাসি শুনে কত উদ্ভট কথাই মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল—এখানকার বিচিত্র রহস্যের মত পরানও বদলে গেছে বুঝি। শিউরে উঠেছিল সে।

তারপর মানুষের সঙ্গে কথা বলে সে ভুল তার ভেঙেছে, সহজ হয়েছে মন

সহজ হয়েছে ভরতের মনও, যখনই মহিমকে পেয়েছে সে। তবু নিভে আসা উৎকণ্ঠার মধ্যেই কৌতূহল তার বেড়েই উঠল।

বলল, তা, বাবুরা ডেকে কি বললে, বলবি তো সেটা?

বলছিল পিতিমে গড়ার কথা বাবুদের বাড়ীর।

হ্যাঁ? উল্লসিত মনে হল ভরতকে। বলল, তোরে চেনে তা'লে বাবুরা? অ, সবই জানে তা'লে, তোর ওই পুতুল-পিতিমে গড়ার কথা?

হ্যাঁ, তাই মনে হল।

মনে হল? ভাইটার কথায় উদাসীনতার বিদ্রূপের আভাস খুঁজে পেল ভরত। ছোঁড়া রেয়াৎ করে না মোটে। কিন্তু সে রাগ করল না। বলল, তা না হবে কেন? কত্তা তো শুনেছি খুব ভদ্দরনোক মানুষ। কলকেতায় থাকে কি-না? নেকাপড়ার গুণ আলাদা। আবার পাশ করা বউ এনেছে।

কথাটাতে চমকে উঠল মহিম। ও, গাঁয়ের সকলেই তা হলে উমাকে জানে। একমাত্র তারই জানা এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সত্যাই, উমা তো আর পুরোপুরি অন্দরবাসিনী নয়। গাঁয়ের লোকে তাকে চিনবে বই-কি! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

তা তুই কি বললি? গড়বি?

নিস্পৃহ গলায় বলল মহিম, না।

না? কথাটা অপ্র্যাশিত। বরং ভরত ভেবেছিল, মহিম হ্যাঁ বললে সে দু-একটা খোঁটা দিতে পারবে ভাইকে। কিন্তু সেটা হত নিতান্তই মৌখিক। আসলে সে আচমকা ভয়ানক নিরাশায় খেপেই উঠল কথাটা শুনে।

না কেন বললি?

সময় কোথা? সময় নাই। আর পিতিমে গড়া—ওসব আমার খারা হবে না আর।

কেন? তাজ্জব হল ভরত। বলল, ওই দিয়েই তো তুই হাত পাকালি।

কথাটা শুনে রাগ হল মহিমের। দিন কি মানুষের সমান যায় গো, না, মনটা চিরকাল একরকমই থাকে! আজ যা মানুষের মন ভোলায়, কাল আর তা ভাল লাগে না। কবে কোন্‌কালে ঠাকুর গড়তে ভাল লেগেছে, তাই বলে অ-আ-ক-খ কি মানুষের চিরকালই পড়তে ভাল লাগে। মহিম বেদনা বোধ করে, রুষ্ট হয় ভরতের উপর। ভরতের কাছে শিল্পবোধের কোন মূল্য নেই। জবাব দিল না সে।

ভরত বলল, ঠাকুরের মূর্তি তো তুই গড়িস, তবে পিতিমে গড়বি না কেন?

মন চায় না?

ভ্যালা রে তোর মন! প্রায় ধমকের মত বলে উঠল ভরত। তা কেন চাইবে মন! এতে যে এট্টু ঘরের সাচ্চয় হত। তা, তোর সইবে না।

আচমকা আঘাতে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল মহিম। কথাটা নির্মম সত্য, কিন্তু বেদনারও। আরও কয়েকদিন মহিমকে সোজাসুজি না হোক প্রকারান্তরে এরকম কথা বলেছে। সত্যই, মহিম এখন বড় হয়েছে, সংসারের ভার তাকেও খানিক বইতে হবে বই-কি! চিরদিনই কিছু আর এমনি স্বপ্নছায়ার তলে জীবন কাটবে না। মহিমও তা জানে। জানে বলেই বেদনা তার এত বেশি। এ বেদনাবোধের জন্যও আছে কিছু বিক্ষোভ। বেদনাই বা কেন? কেমন করে দিন চলে, কবে আর সে খবর সে রেখেছে! কবে আর ভেবেছে, কোনো দিনেকের তরে জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে তাকেও আর দশটা মানুষেরই মত

বাস্তবের জীবনযুদ্ধের পথে শরিক হতে হবে। ভাবতে হবে, কত ধানে কত চাল, স্বপ্ন দিয়ে পেট মানে না। সে তো পরম নির্ভরশীল, পরের কাঁধে ভর করে আছে। আজ না হোক কাল—একদিন না একদিন মুখের কথা খসবেই, আর সেই খসাতে যদি মুখের গরাস খসার কারণ হয়ে ওঠে, সেদিনের ভাবনা কি নয়নপুরের খালের জলে খাবি খেয়ে ডুবেই শেষ হবে? তা তো হবে না।

কিন্তু এও আবার সত্য যে, ভরত বলে অনেক কথা, কিন্তু মহিমকে তার ভেতরের মনটার ছায়াতলে সে-ই তো রেখেছে ঘিরে। সাতে পাঁচে থেকেও সাতে পাঁচে না থাকার মত মানুষ ভরত। মুখে অমন কত কথাই বলে সে। রাগের সময় রাগে, হাসির সময় হাসে। মনে যা আসে তাই বলে। আর না বললেই বা চলবে কেন? শত হলেও ছোটভাই তো! তা, সে সৎ হোক আর সহোদর হোক।

কিন্তু এখন মহিমকে চুপ করে থাকতে দেখে ভরত বুঝল, কথাটা লেগেছে মহিমের। ছোঁড়ার লাগেও আবার বেশি। কি এমন কথাটা বলেছে সে যে একেবারে গুম্ মেরে যেতে হবে! অন্যায় কথা তো কিছু বলেনি সে। বাবুদের বাড়ীর পিতিমে গড়লে, কোন্ না আজ পঞ্চাশটা টাকা আসত ঘরে। কিন্তু ভাইয়ের তার সেদিকে টান নেই মোটে। উদাসীন বড়। উদাসীন থাকলে চলবে কেন চিরকাল? জীবনটারে নিতে হবে তো গুছিয়ে গাছিয়ে। হ্যাঁ, হিসেবী মানুষ ভরত। সেধে লক্ষ্মী আসতে যদি চায় ঘরে, তা সে কষ্ট স্বীকার করেও আনতে হবে। তার মানে, ভাই তার আপনভোলা হোক, কিন্তু পয়সার বেলা আপনভোলাগিরি চলে নাকি? তখন নাকি চলে একটু চনমনে না হলে?

বলল, রাগ করলি বুঝিন্?

না।

না কেন, রাগই তো করেছিস? কথাটা কিছু অন্যাঘ্য বলছি বুঝিন্ আমি? গুলা পঞ্চাশ টাকা তো—

মহিম শান্ত ভাবেই বলে উঠল, বলব বাবুদের। কথা ফিরিয়ে নিতে আর কতক্ষণ।

হ্যাঁ, কথা ফিরিয়ে নেবে না, ছাই করবে। বলে ফেলেছিস, চুকে গেছে। দেখা যাবে আবার বছর ঘুরলে। এরকম কথা বললেই আবার খটকা লাগে মহিমের। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কথাটা রাগের না অরাগের। বলল, তাতে কি হইছে, মান তো আর বয়ে যাবে না।

ভরত বলে উঠল—যাবে না তো কি? মুখের কথার দাম নেই নাকি? বাবু বলে তো পীর নয় তারা।

আশ্চর্য! লোকটা পাড়া ঘুরে ঝগড়া বিবাদ করে, ঠ্যাঙাঠেঙি করে, সদরে মামলা করতে ছোটে। বাড়ীতে চেঁচায়, তম্বি করে, সে এক রকম। বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এ আবার কি? হঠাৎ মুখে একটা শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভরত। আ-মলো, এ-যে পশ্চিম পাড়ায় চলে আসছি।

এসেছে মহিম। আর কথার ফাঁকে ভুলে তাকে অনুসরণ করে চলে এসেছে ভরত।

তোর বউদি বোধ হয় আবার এতোক্ষণ হা হুতোশ করছে, ফিরে চল্ তাড়াতাড়ি।

পশ্চিম পাড়ার শেষ সীমানায় গোবিন্দের ঘর। বৈষ্ণবী বনলতাদের আখড়ার কাড়াকাছি।

মহিম বলল, এসেই পড়ছি যখন, একবার ঘুরে আসি গোবিন্দের কাছ থেকে।

হ্যাঁ, তা না হলে আর পাগলের মেলা জমবে কেন? ভরত ধমকে উঠল।—চল্ চল্, সে আবার ভাত নিয়ে বসে আছে।

গোবিন্দকেও ভরত পাগল মনে করে। যেমন পাগল মনে করে বামুনদের গৌরাঙ্গসুন্দরকে, তেমনি। কারণ, এসব লোক তথাকথিত পাগলের মত গালাগালি দেওয়া অথবা হিংস্র প্রকৃতির আর দশটা পাগলের মত নয়। এরা নায় খায় শোয় হাসে কথা বলে, তবু এদের নাগাল পাওয়া দায়। বহু দূর ফারাক যেন রয়েছে এদের সঙ্গে আর সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে। সংসারের মধ্যে থেকেও এরা সংসার থেকে দূরে। ভরত বলে পাগল, কিন্তু ওদের পাগলামো সমীহ জাগায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নীচতায়-হীনতায় কলহে-ঝগড়ায় ওরাই একমাত্র শান্তির ধ্বজাধারী। পাগল বলে, কিন্তু বিদ্বেষ, উপেক্ষা, অসামাজিকতার সুর নেই তাতে।

তবু মহিম বলল, মোর পিত্যেশ করে বা বসে আছে গোবিন?

তা বলে এত রাতে যেতেই লাগবে, এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে নাকি? ছাখো দেকি কাণ্ড!

বন্ধুত্ব বড় ভারী। দিনেকের তরে বাদ যায় না দুই বন্ধুর ক্ষণেকের মিলন। প্রতিদিনের দেখা, প্রতিদিনে নতুন করে আগ্রহ বেড়েই চলে, উদ্‌গ্রীব উদ্বেলতা, ব্যাকুল আবেগের সঙ্গে মিশে থাকে প্রতিদিনের মিলনের সময়টিতে। একে খানিকটা বলতে গেলে লোকচক্ষে বন্ধুত্বের বাড়াবাড়ি, ঈর্ষাকাতরও করে বই-কি মানুষকে এ বন্ধুত্ব! বলতে ছাড়ে না লোকে যে, এটা খানিকটা নেড়ানেড়ীর ভাবে ঢলাঢলি কাণ্ড। মনের মিলের হদিস সেই দেখন্-চোখে এই দু'জনে। তর্কবিতর্ক দৈনন্দিন, কাজেকর্মে আলাদা, অমিল যেন পর্বত সমান। তবু নিয়ত ছিন্নোন্মুখ

সুতোটির কোনখানের গেরোটিতে যে এ শিল্পী আর সাধক বাঁধা—তা কেউ খুঁজে পায় না।

আজ সত্যিই ব্যতিক্রম দেখা দিল, যে ব্যতিক্রমের সূত্রপাত আজ জমিদার বাড়ীর ডাক করেছে। রাত্রি অনেক হয়েছে, তৎসঙ্গে অহল্যার কথাও মনে পড়ল মহিমের। সে ভরতের সঙ্গে ঘরের দিকেই চলল! কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে।

বাড়ি যেতে অনেকটা দূর থেকেই তারা দেখতে পেল, বাইরের দরজায় একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে পথটা আলোকিত করে। আর পথের মাঝে আলোয় কম্পিত ছায়া ফেলে বউ একটি দাঁড়িয়ে আছে—এদিক পানে চেয়ে।

মহিম-ভরতের চকিতে একবার চোখাচোখি হল। ভরতের চোখে অভিযোগ, মহিম সেই অভিযোগ মেনে অপ্রতিভ। কারণ তারা উভয়েই বুঝতে পারল, রাত্রের নির্জন পথে উদ্বেগে দাঁড়িয়ে আছে অহল্যাই।

তাদের দু'জনকে চোখে পড়া মাত্র আলো নিয়ে অহল্যা অন্তর্ধান হল। তাতে তার ক্রোধের মাত্রা পরিস্ফুট হল আরও বেশি।

মহিম আর ভরত বাড়ি ঢুকে হাত মুখ ধুয়ে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হল। অহল্যা থালায় ভাত বেড়ে প্রস্তুত। কেউ-ই কোন কথা বলল না। মহিম আর ভরত কথা বলতে ভরসা পেল না।

তারা বসা মাত্র ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে অহল্যা হেঁসেল গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভরত জিজ্ঞেস করল, খাবে না তুমি?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু ভরতের খাওয়া আটকাল না তাতে। সে খেতে খেতেই বলল, পথে আবার একটু কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। এ ছোঁড়া আবার এত রাতে বলে—গোবিনের ঠাঁয় যাবে।

গেলেই তো হত। নিস্পৃহ গলায় বলল বটে কথাটা অহল্যা, কিন্তু তাতে রাগের মাত্রা প্রকাশ পেল আরও বেশি।

মহিম হাত গুটিয়ে নিয়ে কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই মানিকের গলা শোনা গেল। ছেলে মানুষ, বছর ষোল বয়স। বাপ-মা নেই বলে এই বয়সেই কামলার কাজ ধরেছে। ডাকা-বুকো ডানপিটে, ভূতপ্রেতের দোসর বেহ্মদত্যির হুকুমে চলা মানিক। কোন কিছুতে প্রত্যয় নেই। বড় মানে না ছোট মানে না, মানে না জাত-বিজাত—মানে খানিকটা অহল্যাকে। এই মানার মধ্যে আছে হয়তো কিছু বিচিত্র মনের রঙ, যার হদিশ অহল্যারও জানা নেই বুঝি।

মানিক উঠোন থেকেই বলে উঠল, কাকী গো, মহিমকাকা বাবুদের বাড়ি থেকে তো চলে আসছে অনেকক্ষণ! বলতে বলতে কাছে এসে তাদের দেখতে পেয়েই বলে উঠল, হেই খ্যাখো, ভরতকাকাও এসে পড়ছে। তোমাদের লেগে কেমন করতেছিল কাকী। বাইরে গেলে তোমরা ঘরে ফিরতে ভুলে যাও কেন বল তো বাপু?

হ্যাঁ, এমনি পাকা পাকা কথা মানিকের। কিন্তু ভরত তো সাধারণত রাত্রি করেই আসে, আজকের ব্যাপারটা মহিমের জন্য। এবং আজকের ব্যাপারটা, এই উদ্বেগে ভয়ে মানিককে পাঠানো, আর সেটা ধরা পড়ে যাওয়া, বিশেষ করে এই মুহূর্তেই, তাতে সে খানিকটা লজ্জা পেল। কিন্তু লজ্জায় সে অপ্রতিভ হতে চাইল না।

বলল মানিককে, নে হইছে। ঘটি ভরে জল নিয়ে বোস্ দি নি। ভাত কটা খেয়ে নে।

বটে, সে আশায় হেঁসেল নিয়ে বসে আছ কাকী তুমি? মানিক বলল, পাগলা বামুনদের বাড়িতে যে আজ পেট ঠেসে খাওয়ালে। ওদের

সেই গড়পারের হিজল গাছটা আজ একা একাই চুপিয়ে নাবিয়ে দিলাম কি না।

বেশ করছিস্। অহল্যা বলল, তা বলে পেটে তোর চাড্ডি ভাতের জায়গা নাই নাকি রে!

কথার শেষে সে লক্ষ্য করল মহিম খাচ্ছে না। ভরত ভীষণ গম্ভীর। মাঝে মাঝে সে লক্ষ্য করছে মানিককে। বুঝতে পারল এ হতচ্ছাড়া হারামজাদা ছেলেটা তার ঘরের হাঁড়ি থেকে নির্ঘাৎ কিছু গিলবে। এ নিয়ে অহল্যাকে বহুদিন বহু কথা বলেছে, কিন্তু তার প্রতি বউটির মায়া দেখলে গা জলে। নিজে না খেয়ে খাওয়ায় সে মান্‌কে ছোঁড়াকে।

আর মহিম বুঝল মানিককে যে চাট্টি ভাত খাওয়ার জন্য অহল্যা ডাকছে—সে ভাত অহল্যার নিজের জন্য রাঁধা। রাগ হয়েছে, তাই নিজে না খেয়ে সে খাওয়াতে চায় মানিককে।

চিরকাল যেমন সে করে, আজও তাই করল। হাত গুটিয়ে বলল, বলছে তো ওর পেট ভরা আছে। তুমি খাবে না?

কোন জবাব দিল না অহল্যা।

ভরতের খাওয়া প্রায় শেষ। এসব রাগ-অভিমানের দিকে সে বড় একটা খেয়াল করে না। নিতান্ত গম্ভীর ভারী মানুষ, ঘরের কর্তা। মান-অভিমান-সাধাসাধি ওসব মহিম-অহল্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভরতের তা নেই, আর মনে করে বোধ হয় সে যে, তা থাকতেও নেই। কেবল বলল, নেও নেও, খেয়ে নেও।

বলে আল্‌গা করে ঘটি ধরে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে উঠে পড়ল সে।

কই, ভাত বাড়ো? মহিম আবার বলল, ইচ্ছা করে দেরি করছ নাকি?

না, ইচ্ছা করে নয়। তাই এত রাতে আবার পশ্চিম পাড়ায় যাবার সাধ হইছিল।

তা বটে। মহিম বুঝল এত রাতে আবার আড্ডার ইচ্ছাটা অপ-রাধই। সে বলল, যাই নাই তো! তবে? .... খেয়ে নেও।

বড় অল্পেতে অহল্যা রাগে। বড় সহজে তার দাবি আদায় করতে চায় সে। অভিমানিনী বেশি, মন তার কিছুতেই যেন তুষ্ট হতে চায় না। এমনি সাধারণ সরল চাষী-বউ। তবু এক-একসময় আসে —তার একটা চরম পরিণতির সময়, যখনকার ভাব কথা হাসি গান কিছুরই কোন হদিস পায় না কেউ। মহিম নয়, ভরত নয়। কঠোরতায় বিহ্বলতায় সে এক অপূর্ব অহল্যা। কলকাতায় পাগলা গৌরাঙ্গের চোখের জলের কথা শুনে অহল্যা কি কঠিন রূঢ়তায় বলে উঠেছিল, যেমন কর্ম তার তেমন শাস্তি। পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতি তার নিষ্ঠুরতা দেখলে মহিম আশ্চর্যই হয়। হ্যাঁ, সেদিন মহিমকে নিয়ে ফিরে আসার পথে উমার মত সেই বিদ্রূপ আর ডঙ্কা বাজিয়ে ফেরার মত হাসিতে বঙ্কিম রেখায় বেঁকে গিয়েছিল তার ঠোঁট। কিন্তু মহিম তো চোখের জলই ফেলেছিল। সেদিন এ সাধারণ বউটির কোন মায়ার উদ্রেকের লক্ষণ দেখা যায়নি মহিমের কান্নায়। বরং রাগ করেই বলেছিল, তবে ফিরে যাও তোমার পাগলা বামুনের কাছে।

অহল্যা দেখল অপরাধ স্বীকারে কি করুণ আর শিশুর মত হয়ে উঠেছে মহিমের মুখখানি। নিছক মাটির মন তার, তাও বুঝি খালের জলের ধারে নরম মাটির মত। হাওয়ার টানে শুকোয়, রৌদ্রে জমে যায় আবার জোয়ারের এক ধাক্কাতেই গলে গলে মিশে যায়, একেবারে তলিয়ে যাওয়ার মত।

আর এমনি গলে যাওয়ার মুহূর্তে তারই অজ্ঞানতে তার চোখ দুটো

পলকহীন হয়ে পড়ে। সে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মহিম মনের হদিস পায় না অহল্যার। এ চোখের মধ্যে জমিদারের পুত্রবধূর উচ্ছ্বাস আর তীব্রতা না থাকলেও বিস্মিত বিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন।

কই, খাও, মহিম বলল।

অহল্যা যেন আচমকা নিঃশ্বাস ফেলে আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, আর যমের বাড়ি গিয়ে খাবো।

ও! রাগ তা হলে কমেনি অহল্যার এখনও। মহিম সোজা বাঁ হাত দিয়ে অহল্যার একটা পা চেপে ধরল। এই পা ছুঁয়ে বলছি আর দেরি হবে না।

অহল্যা হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। ছাড়ো ছাড়ো, হয়েছে।

বল আগে, খাবে কি না।

খাচ্ছি খাচ্ছি। অত দরদ দেখাতে হবে না।

বলে, খাবে না। হ্যাঁ! বলে মহিম আবার খেতে শুরু করল।

মানিকও হাসছিল। অহল্যা মাথা নিচু করে তখনও বুঝি হাসছিল, তাই তার শরীরটা দুলে দুলে উঠছিল দমকে দমকে। মাথা নিচু করেই সে ভাত বাড়তে লাগল দুটো থালায়। একটা মানিকের, একটা তার।

মহিম খেয়ে ওঠবার সময়ও দেখল অহল্যা মাথা নিচু করে আছে। বললে, তুমি খানিক পাগলও বটে বউদি।

বলে সে বেরিয়ে গেল।

সামনের বাড়া ভাতের থালায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরতেই তাড়াতাড়ি চোখ মুছল অহল্যা।

ও! অহল্যা বুঝি কাঁদছে। কেন?

তা বুঝি কেউ জানে না এ তার সেই বাঁধা বীণার তারের বেসুর?

যে স্বগত বেসুরের ধ্বনি আর রূপ বাইরে ঢাকা পড়ে থাকে? যার তরঙ্গ কোথাও কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না, নিতান্তই একলার?

—নে মানিক, ভাত ক'টা নিয়ে বাইরে বোস। থালাটা এগিয়ে দিল।

তার চোখের জল দেখে বিস্মিত বিমূঢ় মানিক থালাটা নিয়ে গিয়ে বাইরে বসল। কিছু বলতে পারল না।

হাত মুখ ধুয়ে মহিম আবার এদিকে আসতেই অহল্যা তাকে ডাকল। জমিদার বাড়িতে কি কথা হল বললে না?

বলব। বলে মহিম বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চেপে বসল ঘরের দরজাটির গোড়ায়।

ঘুমন্ত ভরতের নিঃশ্বাসের উচ্চধ্বনি শোনা গেল।

[৬

পরদিন প্রভাতবেলা। তখনও সূর্য ওঠেনি। পূর্বাকাশে তার রক্তিম ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে মাত্র। আর সমস্ত আকাশটা জুড়ে শাদা যাযাবর মেঘের দল উড়ে উড়ে চলেছে। ঋতু শরতের রূপ, আলো ছায়ার খেলায় বিচিত্র শরতের রূপ। ঘন সবুজে ভরা ঝাড় বন গাছের পাতাগুলো অল্প শিশিরে ধোয়া নতুন কাজলে যেন চকচক্ করছে।

মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের মেলা। মেলা নয়, ঋতু শরতের খাসা সবুজ ওড়নার লুটোপুটি মেলা। গোবিন্দ ঘুম থেকে উঠতেই প্রথমে তার মনে পড়ল মহিম গতকাল আসে নি। না আসার ব্যতিক্রমটা নতুন নয়, কিন্তু কারণ জানান দেওয়া থাকত আগে। আর ব্যতিক্রমটা এতই কম যে, সে কথা মনেই থাকে না। নিতান্ত অসুখ-বিসুখ না হলে শত ঝামেলা ঠেকিয়েও তো মহিম ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে গেছে। দু-দণ্ড বসবার সময় না থাকলে বলে গেছে, মনে বিঘ্ন নিয়ে চলে গেছে কথা বলতে না পারার জন্য। দৈনন্দিন জীবনের ব্যত্যয়টা এত বড়, ঘুম ভাঙতে মহেশ্বরের করুণা ভিক্ষার আগেই তা মনে পড়ল। মহিম কাল আসেনি।

বর্ষা শেষ, ম্যালেরিয়া জমে ওঠার সময়, সেই সঙ্গে আরও নানান্ রোগ। গোবিন্দ শঙ্কিত হল, মহিমের মঙ্গল কামনা করে মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল সে।

গোবিন্দ তরুণ। তার অধ্যাত্ম বিশ্বাস অজস্র দেবদেবীর ভারে আক্র

ভিড়ে ঝামেলায় ঝালাপালা নয়। তার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মিশেছে জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা। যে অধ্যাত্ম জগৎ বিচিত্র এক রহস্যে ঘেরা, যা এ পৃথিবীর আড়ালে থেকেও নিয়ত বিরাজমান, তার পরিচালক এবং পরিচালনার রহস্য সম্বন্ধে সে শিশুকাল থেকেই অনুসন্ধিৎসু।

এর কারণ আছে। তার বাবা ছিল তান্ত্রিক, তন্ত্রোপাসক। মহাশক্তির পূজারী। জীবনের শেষ কতগুলো বছর তাঁর শ্মশানে মশানেই কেটেছে।

রাত্রিদিন ভাবে বিভোর, ধ্যানস্থ, সিন্দুরচর্চিত কপাল, সিন্দুরের মত লাল চোখ ছিল তার বাবার। ঝড় বন্যা—কীটপশুর বিষ্ঠার আস্তাকুঁড়ে ছিল যাযাবর জীবন। সাধনায় সে ছিল মহান গোবিন্দের কাছে। এ জগতে থেকেও ছিল না এ জগতে। জগৎ ছিল তাঁর আলাদা। সাধারণের অদৃশ্যে সে—সেই জগতের মানুষের সঙ্গেই কথা বলেছে, খেলা করেছে। তাদেরই সঙ্গে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাতে গিয়ে—ঘরের ভাত খায়নি কোনদিন, স্পর্শ করেনি কোন দিন এই ভিটে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য কোন বস্তু।

খেয়েছে মড়ার খুলিতে করে, মৃতের মেদ মজ্জা মাংস। মহাদেবের মত প্রায় উলঙ্গ হয়ে যোগ-সাধনার জন্য পড়ে থেকেছে—নরকে। উজাড় করেছে পাত্রের পর পাত্র কারণ। চোখে না দেখলেও শুনেছে গোবিন্দ—এই সবই নাকি দেবত্বপ্রাপ্তির আনুষ্ঠানিক কর্তব্যের খাতিরে। দেবত্ব প্রাপ্তি অর্থে শক্তিসাধনা একমাত্র কর্ম। সিদ্ধিলাভ অর্থে নিজের মধ্যেই সর্বভূতকে অনুভব করা। আরও শুনেছে, যা শুনে তার কিশোর হৃদয় প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আর কি, বিশেষ করে তখনও অর্ধজীবিতা তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। তার মা তখন ক্রমাগত মোটা পাটের দড়ির গা থেকে এক এক পরত খুলে নেওয়ার মত জীর্ণ ও ছিন্নোন্মুখ হয়ে উঠেছিল। মুখে কিছু না বললেও, মায়ের

এ ক্রমাগত অস্তিত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণটা প্রায় আঁচ করে নিয়েছিল সে। বোধ হয় সবই সয়েছিল তার মায়ের, সইল না, যখন শুনল তাঁর প্রৌঢ় তান্ত্রিক স্বামী শ্মশানে ভৈরবী জাগিয়ে শিবত্ব লাভে তন্ত্রসায়রে নিমজ্জিত।

কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না শুধু নয়, উপরন্তু মহাদেবের অংশ প্রাপ্তির এ মহান সাধনাকে প্রকাশ্যেই অভিনন্দন জানাল।

ভৈরবী? সে আবার কে? রাঙপুরের চক্রবর্তীদের লুণ্ঠিতা ধর্ষিতা—সমাজের প্রান্ত থেকে বিতাড়িত এক আধা-রূপসী বউ।

কিন্তু তান্ত্রিকের স্পর্শে, সেই ধর্ষিতা পেয়েছিল সেদিন রক্তজবার অঞ্জলি ধার্মিক জনতার আকুল প্রসারিত হাত থেকে, যা নাকি গোবিন্দের মাকে নিঃসন্দেহে একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু পিতার উপর পুরোপুরি বিদ্রোহ করতেও কোথায় যেন তার একটা দ্বিধা ছিল। দুঃখটা মায়ের নিজের সৃষ্টি, প্রকাশ্যে না হোক্, প্রকারান্তরে সে একথাই ধরে নিয়েছিল।

তারপর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তার মা তাকে সঙ্গে করে খাল-পারের শ্মশানে গিয়ে উঠল।

মহাদেবের মত তখন তার বাবা হাড়গোড়ের মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় শিব-নেত্রে বসে। অদূরে ছাই-গাদায় অর্ধউলঙ্গ শায়িতা ভৈরবী। উভয়েই ভক্তবৃন্দ-পরিজনে ঘেরা।

সবই মনে হল গোবিন্দের বীভৎস। চোখ দুটো তার বুজেই গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু ভক্তিও কম ছিল না। এবং কারুর নির্দেশ ব্যতীতই সে হাত তুলে দেবতাদের নমস্কার করেছিল।

ছেলের এই কাণ্ড দেখে, যে টুকু উৎসাহ আর আশা নিয়ে তার মা

স্বামীর কাছে এসেছিল, তা যেন গেল আরও স্তিমিত হয়ে। ভক্ত পেয়েছিল পুত্রের মধ্যে এ ভক্তির সঞ্চারণ দেখে।

তবুও সে লজ্জার মাথা খেয়ে তার স্বামীকে ডাকল। আপত্তি না করে ভোলানাথভক্ত হেসে উঠে এল তার স্ত্রীর কাছে। সরে গেল তারা একটু আড়ালে—একটু দূরে।

সব কথা যেন মনে নেই গোবিন্দের। খালি মনে পড়ে তার মা ডুকরে উঠে বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল, মোরে খানিক চিকিচ্ছে করিয়ে, মোর শরীলটারে ভাল করে তুললে না কেন? চিরকালই তো আর আমি এমনি কুৎসিত ছিলাম না। তোমার সঙ্গে শ্মশানে কেন, যে-কোন নরকে গিয়েও তোমার ভৈরবী হইতাম।

গোবিন্দেরও বুকটা ফেটে যাচ্ছিল মায়ের ডুকরানিতে। কিন্তু সেদিন তার অতি অল্প রেখান্বিত গোঁফে ক্রোধও দেখা দিয়েছিল মায়ের এ ধর্মবিরুদ্ধ অর্বাচীনতায়।

কিন্তু আশ্চর্য! তার বাবা রাগ করেনি। কেমন এক রকম ভেঙে পড়ার মত হেসে বলেছিল, এ কথা আজ আর কেন বলতে এলি ন-বউ। ছোঁড়াটারে নিয়া ঘরে যা।

আর একটিও কথা না বলে চলে গিয়েছিল তার বাবা। তাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল তার মা। কিন্তু কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক থেকে গেল গোবিন্দের বুকে, যে ফাঁকটার মধ্য দিয়ে আজও হাহাকার শোনা যায়। যে হা হা শব্দ আজও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—অজানা নিরুদ্দেশ কোন এক পথে।

কয়েক দিন পরে মায়ের মৃত্যু সেই ফাঁকটাকে আরও বড় করে দিয়ে গেল, এল তার এক পিসিমা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে।

কিন্তু গোবিন্দের জীবনের নীলাকাশে সেদিন এমনি শরৎ মেঘের

ভিড়। কোথাও স্পষ্ট কোথাও দ্বিধা। কৈশোর জীবনটাকে এক অদ্ভুত গাম্ভীর্যে আর ছটফটানিতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।

তাই আচমকাই সে একদিন শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। ভৈরবী নেই, বাপ তার একলা। স্বস্তি পেল সে।

বাপও দেখল, কিশোর ছেলের কঠিন মুখ, জীবনের কোন এক আদিম নির্মম প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল, বল, বাবা, কি তোমার সাধনা?

বাপ বলল, সাধনা শক্তির, মহাশক্তির।

সে শক্তি কে, কোথায়?

সে সর্বভূতেষু। তাকে আপন ক্ষমতায় নিজের মধ্যে টানতে হয়।

তার কোন আকার নাই?

আকার আমি নিজে, আমি আধার। আমিই সব। মহাশক্তির জন্য আমার সংগ্রাম, সংগ্রামই সাধনা।

সে সংগ্রাম কি?

যমুনার উজান বইয়ে যাওয়া। মানুষের মন নিয়ত নীচেরদিকে, তারে উঠতে হইবে উঁচু দিকে। ক্ষণজীবনের সব পরীক্ষায় তাকে পাশ করিতে হইবে। মানুষ নররূপে পশু, সে জন্য তাকে পাশবাচার করেই হজম করিতে হইবে পশুশক্তিকে। বিষপান করিয়াই নীলকণ্ঠ হইতে হইবে। তারপরেই বস্তু ও মানুষ ছাড়াই একলার মধ্যে সমস্ত আনন্দের অনুভব। তাই এখানে মন্ত্রের চেয়ে ক্রিয়া বেশি, বিচার থেকে আচার প্রধান।

গোবিন্দ সব না বুঝলেও এটা বুঝল যে, বীভৎস হলেও এগুলোই সাধনযোগ। বলল, তবে তো তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ?

শক্তি উপাসকের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। চোখ লাল। যেন এখুনি

জল যেঙ্গবে চোখ ফেটে। বলল চাপা স্বরে, না, আমার সিদ্ধিলাভ হয় নাই।

তবে এসব ?

এ সবের সে উদ্দেশ্য করল, এ শ্মশান বাস, ভৈরবী, কারণ পান, মৃতদেহ ভক্ষণ ইত্যাদি। ক্ষণিক বিমূঢ় রইল তার বাবা, তারপরে আচমকা গর্জন করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলের উপর। এ-সব তোর মাথা হারামজাদা। বেরিয়ে যা এখান থেকে।

মার খেয়ে সরে গিয়ে গোবিন্দ বলল, আর এক কথা বল। আমার মা কেন মরল ?

আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

বুকের সেই ফাঁকটা দিয়ে আর্তনাদ উঠল গোবিন্দের। বুঝল, ধর্মের নামে বাপ তার পাপ করেছে এবং শৈশবের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস থেকেই সে বুঝল, প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হবে। বলল, তুমি মরেও তো মা'র কাছেই যাবে। ব'লো, তোমাদের দুজনের সদ্‌গতির সাধনা আমিই করব।

তান্ত্রিক কেঁদে উঠেছিল কি চেঁচিয়ে উঠেছিল, বোঝা যায়নি। বোঝা গিয়েছিল খালি তার কথা, জাহান্নামে যা—

সেইদিন রাত্রেই সাপে ছুবলে মারল গোবিন্দের বাবাকে।

তাতেও খানিকটা শান্তি পেল গোবিন্দ, কিন্তু সে শান্তি এক অসহ্য বেদনাময়, বুকটা ভেঙে যাওয়ার মত প্রায়। এর অন্য কোন অর্থ গোবিন্দ করলেও আসলে এটা স্বজন-হারানোর শোক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ হারানোর বিচিত্র রকমটাই রইল গাঁথা তার মনে।

ফলে এক অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে সে আত্মনিবেদন করল মহেশ্বরের পদপ্রান্তে। বাপের উশৃঙ্খলতার জন্যই বোধ হয় সে আশ্রয় করল

ব্রহ্মচর্য। অধ্যাত্মবাদের সুর লয় তাল, ভক্তিতে শিহরণে রহস্যাবৃত গাম্ভীর্য তাকে আচ্ছন্ন করল, তাকে টান দিল। যেমন টান পড়ে একতারার তারে, এক বিচিত্র সুরশব্দের সঙ্গে তার কাঁপে, কিন্তু স্থান বিচ্যুত হয় না। তা সে তুমি হৃদয় দিয়ে যে সুরই বাজাও, অনুক্ষণ বাজানোর ঝঙ্কার আর কম্পন সে যতক্ষণই থাকুক, একতারার কানে তো, সে বাঁধা। সুর এক সময়ে থামে, তার তখন অকম্পিত স্থির। গতিহীন। গোবিন্দ তাই সুরে আচ্ছন্ন বেপথুমান, কিন্তু বাঁধা রইল।

এবার দেখে শুনে কষে টঙ্কার দিল গোবিন্দের একতারাটায় রাজপুরের সাধক বিরাজ গোঁসাই। গোঁসাই তখন অলৌকিক সাধনায় গুরু ব্যক্তি, তার কালী-কৃষ্ণ সমান, তার ধর্মালোচনা ব্যবহারিক জীবনেরও যোগসূত্র রক্ষা করে। তার ভাবে ও কর্মে সমন্বয় ঘটেছে, তাই ইহজগতে মন-প্রাণ তার ইচ্ছাধীন। তার যেমন কর্ম, তেমনি মন্ত্রও আছে। সে মন্ত্র দেয় লোককে। এ সাধনজয়ীর সবচেয়ে বড় যা ছিল তা হচ্ছে মানুষের কাছে তার সাধক-স্বীকৃতি। গোবিন্দ তার শিষ্য কিন্তু বড় সংশয়ান্বিত, বিনাতর্কে বিশ্বাস নেই। তবুও গুরু।

একবারও ভেবে দেখেনি, ক্রমাগত টঙ্কারে সুরের তরঙ্গগুলো একের পর এক পেরিয়ে সপ্তমের ধাক্কায় তার না আবার ছিঁড়ে সুরভঙ্গ হয়। অবশ্য আজ পর্যন্ত সুরভঙ্গের লক্ষণ কিছু দেখা যায়নি। সুর এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেই চলেছে।

কচিৎ কখনো বাইরের ধাক্কা এসেছে, তবে সে ধাক্কা তারে আর সুরের চেয়ে—একতারাটার আত্মার উপরেই এসেছে বেশি, আত্মাটাকেই তার জয় করতে চেয়েছে। এবং এখানেও সেই পাগলা গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। ধাক্কাটা এসেছে তার কাছ থেকেই অত্যন্ত বিদ্বেষ আর

বিক্ষোভের সঙ্গে। কিন্তু ধর্মের উচ্চ মান সেই আত্মা-জয়ীকে অবহেলাই করে এসেছে।

অধ্যাত্মবাদের প্রাচীন পুঁথিতে ঘরটা ঠাসা গোবিন্দের। দৈনন্দিন সেগুলো থেকে যা সে সঞ্চয় করে, তাই আলোচনা হয় তার সঙ্গে মহিমের। কিন্তু মহিম তো পাগলা গৌরাঙ্গেরই আনাড়ি অনভিজ্ঞ রূপ, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে সে। গোবিন্দও এগিয়েছে, সে জবাব দেয় অদ্ভুত শান্ত আর ধৈর্যের সঙ্গে। নাস্তিকতাকে সে এক অদ্ভুত সৌম্য স্নিগ্ধতার সঙ্গে, অবাধ্য শিশুর গালে চুমু খেয়ে শান্ত করার মত ঠাণ্ডা করে দেয়।

মহিম শান্ত হয়, তৃপ্তি পায় না। ছেলে-ভুলানো চুম্বনে তৃপ্তি নেই তার। কিন্তু অশান্ত হয়েও উঠতে পারে না।

গোবিন্দ কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরুল।

পিসীমা উঠোন নিকোচ্ছে আর প্রাত্যহিক বিড়বিড়ানিও শুরু হয়েছে। কান পেতে না শুনলে শোনা যায় না সে কথা।

ছেলে-মেয়ে নেই পিসীমার। নেই আর বিশেষ কোন আত্মীয়-স্বজন। চিরকাল তাকে খেটে খেটেই খেতে হয়েছে। ঘরে মাঠে গোয়ালেই তার জীবনটা প্রায় কেটে এসেছে, মাঝে এখানে আসার কিছুদিন আগে স্বামীর ভিটেয় থেকে গাঁয়ে শাকপাতা বিক্রী করেও কেটেছে। অভাবকে তাই সে বড় বেশি ভয় করে, ঘৃণা করে।

কিন্তু বিধি বুঝি বাম। চিরটাকাল দুঃখের সঙ্গে মোকাবিলা করে, যৌবনের ভরা বয়স থেকে বৈধব্য জীবন কাটিয়ে অভাবে অনটনের বিরাট ময়ালটার পাক থেকে যদিও বা পাওয়া গেল রেহাই—তাও বুঝি সইল না অনামুখো দেবতার। পিসীর কাছে দেবতা আজ অনামুখো কানা ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে অমন ভাইপো নাকি তার বিবাগী বাউণ্ডুলে

হয়! বাপ ছিল এক ধারায়, ছেলে হল আর এক ধারায়। বাপের ব্যাপার দেখেও ছেলের প্রত্যয় হল না। তাই আবার নতুন বিপর্যয়ের শঙ্কায় বৃদ্ধ বয়সেও শঙ্কিত হতে হয় পিসীকে। যদ্দিন বেঁচে আছে, সঙ্গে আছে পেট। এ বয়সে যদি আজ আবার নিশ্চিত গরাসটুকু খসে পড়ে, কোন্ আস্তাকুঁড়ে আবার ছিঁড়ে খাবে শকুনে।

চাষীর ঘর, কিন্তু গোবিন্দের বাপ ছেড়েছিল সে পথ। পথ ছাড়ার মূল্য হিসাবে জমিজমা বেহাত তো কম হয়নি, কম হয়নি হারাতে।

অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাও বোধ হয় গোবিন্দই শেষ করবে। চাষবাস নেই, চাষীর ঘরের নেই সে জেল্লা, ধানে মানে ভরা সংসার। জমি রইল ভাগে দেওয়া, খোঁজখবর না নেওয়া আপদ বিশেষ। হায় ও-আপদ না থাকলে কোথায় থাকত তোমাদের দুনিয়ার বেহ্মজ্ঞান!

গোবিন্দকে দেখে পিসীর বিড়বিড় করা থামল। উঠোন নিকোতে নিকোতেই বলল, হরেরামের কাছে একবার যেতে নাগবে আজ, সোমবচ্ছর সেই গোলমাল, আগে থাকতেই একটু হিসেব-নিকেশ করে রাখা ভাল বাপু।

হরেরামের কাছেই গোবিন্দদের জমি ভাগে দেওয়া আছে।

—আচ্ছা, আজ যাব। বলে গোবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল।

—যাব টাব নয় বাপু। রোজই তো বলছিস যাবি। নয় তো ওকে ডেকে নিয়ে আয় মোর কাছে। আমিই সব জিজ্ঞেসাবাদ করে নিচ্ছি।

—তা যদি কর পিসী, বড় ভাল হয়।

পিসী জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল।

গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। তাদের বাড়ির পিছনের ডোবাটার ধার দিয়ে আখড়ার পিছনের ঘন কচুবনের পাশ দিয়ে যে স্যাঁতস্যাতে সরু

পথটা খানিকটা ঝোপেঝাড়ে ছাওয়া অন্ধকারে একেবেঁকে গেছে, সেটাই মহিমদের বাড়ি যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।

গোবিন্দ সেই পথেই চলল বন্ধু মহিমের সঙ্গে দেখা করতে। শরৎকালের এ সকাল বেলাটা—বিশেষ এই নির্জন ডাহুকের আস্তানার ধারে পথটিতে এক অনির্বচনীয় গম্ভীর আনন্দে প্রাণটা ভরে উঠতে চাইছে তার, কিন্তু মহিমের কথা মনে করে—একটা বিশ্রী নীরব প্রশ্নে মথিত হয়ে উঠছে মনটা।

হঠাৎ মৃদু ঠুন্ ঠুন্ শব্দে চমকে মুখটা তুলতেই বজ্রাঘাতের মত নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল গোবিন্দ। যেন হঠাৎ চকিতের জন্য টাল খেয়ে উঠল তার সর্বশরীর। ব্যাপারটা তাকে এক রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতা ও বিস্ময়ে (বিস্ময় কেন) আড়ষ্ট করে দিল।

দৃশ্যটা আখড়ার মেয়ে বনলতার কাপড় ছাড়ার দৃশ্য। ব্যাপারটা সত্যই বজ্রাঘাতের মত কিছু নয়। আঁচলের শেষ প্রান্তটুকু তখন বুকের উপর দিয়ে টেনে দেওয়া ছিল বাকি। কিন্তু এ কচুবনে ডাহুকের নির্জন আস্তানায় সে তাড়া ছিল না বনলতার। ঘরের লোকজনের ভিড় কাটিয়ে তাই তো এসেছে সে কচুবনের ধারে, দিনের বেলাতে ও আধো-অন্ধকার ঝোপের ছায়াতে।

গোবিন্দকে বিস্মিত আড়ষ্ট করল কি তবে—বনলতার উদ্ধত যৌবন। হ্যাঁ, বনলতা শ্যামাঙ্গিনী হলেও সুন্দরী। সাত বছরে তার প্রথম বিয়ে, আবার তেরো বছর বয়সে, তারপর উনিশ। কিন্তু তার জীবনের প্রজাপতির পাখা ঝাপটায় মৃত্যুই এসেছে বার বার, তিনবার তার তিনটি স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবু ভেঙে পড়বার লক্ষণের বদলে, একুশ বছর বয়সে তার বলিষ্ঠ দেহে বিদ্রোহের ছাপটাই চোখে পড়ে। পড়ে বোধ হয় একটু বেশি করে।

মুহূর্ত মাত্র। গোবিন্দ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে গেল। সে মেনে নিতে চাইল না তার যৌবনের এ বিপর্যয়কে, অনিচ্ছাকৃত আচমকা একটা বিরক্তিকর দৃশ্য ছাড়া। একমেবাদ্বিতীয়মের এ সাধকাটি তার সৌন্দর্যপিপাসু সুন্দর চোখ দুটোকে মনে মনে খুব কষে খোঁচাল। মনে মনে বলল, জীবনের বিঘ্নগুলোর এটা একটা।

কিন্তু চোখ এড়াতে পারল না বনলতার। চকিতে কাপড়টা টেনে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল সে। ডাকল, সাধু, সাধু, শোন!

গোবিন্দকে সে বলে সাধু। প্রতিবেশী হিসাবে, গোবিন্দের কাছে তার প্রগল্‌ভতার বাড়াবাড়ি লোকচক্ষুর আড়ালে নয়। বিদ্রোহের মত প্রকাশ তা এই শান্ত সাধকটির কাছেই তার বেশি। সে ভালবাসে শান্ত সাধকটির নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় বাধা দিতে। তার সাধনাকে ভীরু বলতে। সে ভালবাসে সাধকটিকে বিরক্ত করতে, মনোকষ্ট দিতে, জালাতন করতে, কঠিন বিদ্রূপে আঘাত করতে। এমন কি, পিসীর হয়ে কোমর বেঁধে গোবিন্দের সঙ্গে ঝগড়া করতেও দেখা যায় তাকে। পিসীর সঙ্গে গলা বাড়িয়ে অনুযোগ করে, ধর্মউদাসী বাউণ্ডুলেগিরির জন্য। কত রূঢ় কথাই তাকে বলেছে গোবিন্দ, সবই ধুয়ে গেছে যেন জলতরঙ্গে, অত মান-অপমানের ধার ধারে না বনলতা।

বনলতার ডাকে গোবিন্দ দাঁড়াল, কিন্তু ফিরে তাকাল না।

মুখ টিপে হাসল বনলতা। বলল, কাছে এস।

বল্ না, কি বলবি? গোবিন্দ দূর থেকেই বলল।

অত চেঁচাতে পারব না, কাছে এস।

মোর সময় নেই।

ওঃ, কি একেবারে মাঠে তুমি পাকা ধান ফেলে আসছ!

ঠাট্টা হলেও কথাটার মধ্যে একটা পারিবারিক খোঁচা ছিল, যে কথা

বলার অধিকার বনলতার নেই বা তাকে কেউ দেয়নি। তবে তাকে দেওয়ার দরকার হয় না, অধিকার সে নিজেই নিতেই পারে। কেন না, গোবিন্দর কাজ সংসারের কাজ নয়, মানুষের দৈনন্দিন ছোঁয়াচ তার নেই বললেই হয়। তার কাজ, তারই কাজ, আর কারুর নয়।

বনলতা নিজেই কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ বোঝা গেল, কষ্ট দুষ্টামিতে তার চোখ দুটো কি অদ্ভুত খেলায় নাচছে। বলল, বলছি, তুমি যেন সাপ দেখে চমকে উঠলা।

সাধকের মনে খানিকটা ঘৃণাবোধই হল। জেনে শুনে নিজের গোপনতম লজ্জার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত তো হলই না এ বৈরাগীর মেয়েটি, উপরন্তু সেই লজ্জার কথাকে নিয়ে দুর্নিবার কৌতুকে হাসছে। তবুও কথাটা নেহাৎ খারাপ বলেনি বনলতা, তাতে মনের তার যে ভাবই প্রকাশ পেয়ে থাক। কেন না, সাপের মত কুটিল হীন পরিহার্য দৃশ্য ছাড়া সেটা সত্যই তার কাছে আর কিছু নয়।

গম্ভীর হয়ে বলল সে, সাপের চেয়েও বুঝি খারাপ। কিন্তু তোর কি লজ্জা নেই বনলতা?

—তোমার কাছে? চকিতের জন্য যেন সমস্ত হাসি-মস্করা কাটিয়ে বনলতা অদ্ভুত গাম্ভীর্যে থমথমিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই হেসে বলল, নাই আবার! এত লজ্জা যে মোর রাখবার ঠাঁই নাই গো সাধু—

বাক্‌পটিয়সী দানবী বৈষ্ণবী, লজ্জা না থাকার বাহাদুরিতে যেন ফেটে পড়ছে বলে মনে হল গোবিন্দের। বলল, তবে?

তবে আবার কি? কোথাও মোর ঠাঁই নাই বলেই তো ঠাঁই রাখি তোমার কাছে।

আশ্চর্য অসতীর কথাই বটে। এমন স্পষ্ট দুর্নীতির কথায় মনটায় কোণে কালি লাগল গোবিন্দের। সে চাইল না আর এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি

করতে। এর পরের কথায় প্রসঙ্গ যে কিভাবে টানবে বনলতা, তা আন্দাজ করে কোন কথা আর সে বলল না, ফিরে চলল। বনলতা মুখে কাপড় চেপে হাসল। তারপর বলল, সাধু, তুমি মহিমের ঠাঁই যাবে?

—কেন?

—যাও তো তারে বলো, আমি ডাকছি। কাল তো সে আসে নাই! আর—আবার সে গোবিন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, যে পথে যাচ্ছিলে, সে পথেই যাও। কালনাগিনী সরে গেছে।

এবার হেসে উঠতে গিয়ে যেন খট করে বাজল বনলতার। কালনাগিনী! সে কথা বনলতা নিজে বলবে কেন, সবাই বলে। কালনাগিনী বনলতা, অনেক খেয়েছে, অনেক ছুবলেছে, কালনাগিনীর নিঃশ্বাসের বজ্র-ভয় কার নেই। কালনাগিনী বনলতা, ফণিনী মাথায় মণি ধরে বিচিত্র রূপবতী, কিন্তু কি সাংঘাতিক, গাঢ় নীল বিষে অনুক্ষণ মৃত্যু বয়ে বেড়ায়! তার রূপ-যৌবন, সবই বিষ, নিঃশ্বাসে বিষ! তার রূপের নীরব টান, উগ্র লোভাতুর করে, নয়নপুরের কত উষ্ণ বুকে দমকা নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে, কিন্তু ত্রাস। ভয়, প্রাণের ভয়, কালনাগিনীর নিঃশ্বাসের ভয়।

কিন্তু গোবিন্দ তটস্থ হল বনলতার কম্পিত ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে। ছলের তো অভাব নেই বনলতার। এই হাসি, এই কান্না, আবার কোন্ নতুন পরিস্থিতি তৈরি করবার ফিকির করছে হয় তো। তবু নিষ্ঠুর সাধকের মনের কোণে হাতের তালুতে মোটা চামড়ায় ছোট্ট বেত কাঁটা সামান্য বেঁধার মত একটু লাগল—আচমকা বনলতার ঠোঁট কাঁপানিতে আর চোখের কোণে উদগত জল দেখে।

আর কোন কথা না বলে সে কচুবনের ভিতর দিয়েই চলে গেল।

গেল না বনলতা। কাপড়ের আঁচলটা সজোরে মুখে চেপে কান্নায় সে ভেঙে পড়ল। কেন? কেন এ কান্না? কেন এমন করে কাঁদতে হয়? কান্নার বেগ যে বুকফাটা। কেন এ অসহ্য কান্না?

কেন, এ প্রশ্ন বুঝি বনলতারও। তাই অস্ফুট আর্তনাদে এ ডাহুকের আস্তানা মথিত হয়ে উঠল, কেন, কেন, কেন? হৃদয়ের অন্ধ বন্ধ-কারাকক্ষের দেয়ালটাকে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে চোখের জলে ডুবে গেল বনলতা। তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, ভগবান, আমায় এই বুকটাকে ছেঁচে-কুটে ধ্বংস করে দাও, আমাকে মুক্ত কর।

হঠাৎ পিঠে একটি আল্‌তো স্পর্শে চমকে উঠল বনলতা। তাকিয়ে দেখল বৈরাগী নরহরি। লম্বা রোগা সুগায়ক নরহরি, বনলতার বাবার পালিত পুত্র-বিশেষ। গানই তার পেশা। শুধু নয়নপুর নয়, নয়নপুরের ওপার রাজপুর থেকে শুরু করে বহু দূর বিস্তৃত অঞ্চলে নরহরি পরিচিত। উদাসী, সাতে পাঁচে না-থাকা নরহরি—সকলেরই প্রিয়পাত্র। এমন কি পাগলা গৌরাঙ্গেরও।

বনলতা তার বান্ধবী।

—কাঁদ কেন সই? নরহরি জিজ্ঞেস করল।

কেন কাঁদে বনলতা? নরহরির এ স্নেহ-প্রশ্নে কান্না যেন বেড়ে উঠতে চাইল।

মনে পড়ল নরহরির, গোবিন্দ গেল এই কিছুক্ষণ আগেই বনলতাকে বুঝি দুঃখ দিয়ে গেছে সেই পাষণ্ড সাধক।

বলল, সই, জগৎ আর মানুষ, সবই বুঝি মাটির, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে লাগে তাতে। কেঁদো না, ঘরে যাও। মানুষের জীবনের সাধনা নাই নাকি? আছে, সাধনা আছে, কেঁদে তো লাভ নাই।

ও, নরহরি বুঝি বনলতার অন্ধ বন্ধ-কারাকক্ষের সেই বন্দিনীটিকে চেনে, তার আত্মার পথচলার অলিগলিগুলোর নীরব দর্শক।

বোধ হয় শান্তি পেল বনলতা; লজ্জাও পেল বোধ হয় একটু এ নির্জন ডাহুকের আস্তানায় কান্না ধরা পড়ে। তবু নরহরিই তো, মনের কথা অকপটে খুলে বলার একমাত্র মানুষ তার। যা বলতে পারে না, তা নরহরি পুরুষ বলে। কিন্তু নরহরিকে তা বলতে হয় না।

নরহরির কথার জবাবে বলল চোখ মুছে বনলতা, জীবনটার ভার আর সইতে পারি না, পরানটার যেন দাম নাই আর।

—ছি সই, ওকথা ক'য়ো না। যুগ যুগ ধরে অজগরের মাথায় যে মণি গজায়, তা যে দেখে সে রাজা হয়। ক'জনা তা দেখতে পায়—কও! যেদিন দেখবে, সেই আলোয় নিজেরে চিনবে রাজা। পরানের দাম নাই তোমার? তোমার পরান তুমি দেখালে কারে, আর দেখলেই বা কে? যাও, ঘরে যাও।'

বনলতা সামলে উঠল অনেকটা। হেসে বলল, কথা তুমি খুব কইতে পার গোঁসাই। বলে কচুবনের মধ্যে দিয়ে আখড়ার দিকে চলল সে।

সেদিকে তাকিয়ে নরহরি হাসল। তার বলিষ্ঠ ঘাড় নুয়ে এল! গুন্ গুন্ করে উঠল সে, 'ভনয়ে বিদ্যাপতি—কৈছে নিরবহ, সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

বার বার করে পদটি গাইল সে। তার সেই গুন্‌গুনানি কাপড়ের আঁচলে আটকা-পড়া মৌমাছিটির মত বনলতার সঙ্গে আখড়া পর্যন্ত গেল। সেও গুন্ গুন্ করে উঠল: 'সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।'

[৭]

বনলতার বাবা নসিরাম তামাক খাওয়া শেষ করে হুঁকোটি রেখে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধ হয়েছে নসিরাম। কোমর খানিকটা বেঁকে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে শরীরটা। একগলা কন্ঠির মালা তেলে আর জলে কালো হয়ে উঠেছে। কপালে গায়ে কুঞ্চিত চামড়ায় বাসি তিলকের দাগ।

আগে নসিরাম খুব শান্ত ধীর ছিল। হাসিখুশি গান কথকতা— সমস্ত কিছুতে সৌম্য! কিন্তু আজকাল তার মেজাজ সর্বদাই খানিকটা ক্ষিপ্ত। কথা বলে অল্প, হাসে না মোটেই। বেশি গোলমাল সইতে পারে না। একমাত্র গানের সময় যা একটু প্রফুল্ল থাকে সে। ইদানীং তার সাধনার রূপরসটা কেটে গিয়ে কঠোর হয়েছে বলা চলে।

তার প্রৌঢ়া সেবাদাসী হরিমতী উঠোন নিকোচ্ছে। হরিমতীর বালিকা মেয়ে স্নান করে ঠাকুরঘরের দাওয়ায় বসে গাঁথছে ফুলের মালা। ষণ্ডামার্কা বৈরাগী প্রাণেশ সমস্ত দেহটি তেলে ডুবিয়ে এবার শুরু করেছে মর্দন। আর মাঝে মাঝে হরিমতীর মেয়ে রাধার দিকে চোরা চোখে দেখছিল। রাধা অবশ্য মাত্র বালিকা, তবু প্রাণেশের চোখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টার মধ্যেও যেটুকু ফুটে উঠেছিল—সে ভাবগতিকটুকু রসের। আর এও সে জানে রাধাকে দেখে তার বুকে এ রসের সঞ্চার টের পেলে কেউ রক্ষা রাখবে না আর। বিশেষ করে হরিমতী যদি টের পায়, আর হরিমতীর খাণ্ডার বলে যা সুনাম আছে, তাতে কোন্ না সে একটা পোড়া কাঠ দিয়েই প্রাণেশের এ রসের ভাণ্ড পিটিয়ে ভাঙবে।

তবু এ চোখকে নিয়ে বড় জ্বালা প্রাণেশের। হাজার ফেরাও চোখ, তবু ঠাকুরঘরের এই জলে ধোয়া ধবধবে ফুলটির দিকেই নজর যাবে তার।

সরযূ এল স্নান শেষ করে, কাঁখে জল-ভরা কলসী নিয়ে। সরযূ প্রায় বনলতারই সমবয়সী, নসিরামের সর্বশেষ সেবাদাসী। এ আখড়ার মধ্যে সে খানিকটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে তার কথায় ব্যবহারে। বৃদ্ধ নসিরামের সঙ্গে মিল তো তার নেই-ই, তা ছাড়া, আখড়ার ভাব-গাম্ভীর্যকে তার তরল হাসিঠাট্টায় বড় ক্ষুণ্ণ করে সে। কিন্তু বাস-কৃষ্ণের সেবায় দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রায় সবই তাকে করতে হয়। ভোগ রান্না থেকে ঠাকুরের শয়ন পর্যন্ত সরযূর কাজ। এত কাজ তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে কথা হাসি গানে ভরপুর।

সরযূকে ঢুকতে দেখেই নসিরামের কোঁচকানো ভ্রূ কুঁচকে উঠল আরও। বলল হরিমতীকে লক্ষ্য করে, পোহর বেলা না কাটলে কি ঠাকুরের ঘুম ভাঙানো হইবে না? আর কখন খোলা হইবে দরজা ঠাকুরের—শুনি?

সরযূ ভেজা কাপড়ে ছপ ছপ শব্দ করে ঘরে ঢুকে যায়।

রাধার তাড়া পড়ল। এখুনি তাকে কুটনো কুটতে যেতে হবে—ভোগের। প্রাণেশও তেলের বাটি রেখে উঠল লাফ দিয়ে।

হরিমতী সরযূর দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁট বাঁকাল। কিন্তু কাজ থামল না তার।

এমনি সময় কানে গেল বনলতার গুনগুনানি: সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

সকলেই একটু তাজ্জব হল, তাকাল বনলতার দিকে। কিন্তু কাজ থামল না কারুর।

নসিরাম বলল, বাসি কাপড় ধুয়ে এলি, নাইলি না?

—না, শরীরটা কেমন গম্ গম্ করছে।

অর্থাৎ গরম গরম ভাব। নসিরাম শঙ্কিত হয়। নিজের বলতে তো তার আর কেউ নেই এক মেয়ে বনলতা ছাড়া। আজকাল এও একটা চিন্তা হয়েছে তার। কেউ-ই তার আপন নয়, সবাই পর। জীবন ভরে সে কৃষ্ণের আরাধনা করেছে, কিন্তু সে কৃষ্ণ সার করেছে গৃহ। শুধু তাই নয়, বুড়ো বয়সে তার ভীমরতিও হয়েছে। বনলতার মায়ের মৃত্যুর পর ধর্ম ও বয়সের ভাঁড়ামোতে সে প্রথমে আনল হরিমতীকে। কিন্তু শেষের দিকে সরযূকে আনতে দেখে বনলতাও ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি। এটা নসিরামের ধর্মের আড়ে বিকৃত মনের হীন লোভ। সে বোঝে যে, বনলতার তার উপরে যেমন টান নেই তেমনি কোন টান নেই এ আখড়ার উপর। এ আখড়ার কারুর সঙ্গেই প্রায় তার কথাবার্তা নেই। বরং নরহরির প্রতি মেয়ের খানিক টান আছে মনে করে তাকেই সে খানিকটা বিশ্বাস করে, কিন্তু নরহরির হাবভাব আখড়া রক্ষা করবার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। বনলতার হাতেই এ সমস্ত কিছু একদিন তাকে তুলে দিয়ে যেতে হবে। বনলতা তার একমাত্র সম্বল। বলল:

—তবে আর এত বিহানে উঠলি কেন, খানিক বেলা বিছানায় থাকলেই পারতিস।

—সে মোর সয় না। বলে এক লহমায় চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বনলতা বেরিয়ে যায় আবার ভেজা কাপড়টা টাঙানো বাঁশে মেলে দিয়ে। এসে উঠল গোবিন্দদের বাড়িতে।

পিসীর তখন নিকানো শেষ হয়েছে। ওদিকে বকবকানির ধ্বনিটাও হয়েছে উচ্চ।

—হায় মোর মরণ নাই, যম কি কানা গো! এ ঘরে নাকি মানুষ

থাকে। না-নোক না জন, এ আখড়াতে মানুষ থাকে কি করে—বল তো? শরীলে নাকি সয় এ সব আর। মরবার দিনেও কাঠ ঠেলতে হবে চুলোয়। কানা যম কানা মিনসে (অর্থাৎ স্বামী) চোখে কি দেখতে পাও না!

বলতে বলতে ক্ষেপে উঠল পিসী। দেখলও না বনলতা এসেছে।

—হক করলাম আজ ও ছাই পুঁথিসুথি সব যদি না পুড়িয়ে শেষ করি। ঢং। চাষার ছেলে হবে পণ্ডিত, সৃষ্টিছাড়া যত অকাজ কুকাজ। বিয়ে নাই, সাদি নাই, নাই একটা ছাওয়াল পাওয়াল, ঘরভরা মরণ-পুঁথি। শ্মশানে-মশানে কালে ছুবলে মারল বাপটাকে, হায় পোড়া-কপাল, এটারও কোন্ দিন যে কি হইবে। মরতে মরতে না জানি কি দেখে যেতে হইবে আমারে। পাপ, পাপ করিয়াছি অনেক এ পিথিমিতে, মরা যম সব শোধ তুলবে। না খাবে আমারে, না খাবে এ চোখজোড়া।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল বনলতা। বলল, কি হল গো পিসী?

এই এক মেয়ে। জ্বলে যায় দেখলে পিসীর সর্বাঙ্গ। বলে কত কথা, ভাল করে দেব তোমার গোবিন্দেরে, ঘরমুখো করে তবে ছাড়ব তোমার ভাইপোরে। পিসী ভাবে, বলে তোরই সেই মুখ ঘুরিয়ে দিল গোবিন্। হ্যাঁ, পিসীরও আছে আতঙ্ক এই সোয়ামীর পর সোয়ামী খাগীর সম্বন্ধে, বিশ্বাস করে, বজ্র ঝরে ওর নিঃশ্বাসে, শোষ টান আছে এ ডাইনী ছুঁড়িটার, শুষে শুষে খায় ও। তবু পিসী যে ওকে আস্কারা দিয়েছিল, সে খালি ছুঁড়ি যদি পারে তার ভাইপোর এ পাথুরে ধর্মজ্ঞানে ফাটল ধরাতে। তারপর ভাইপোরে কেড়ে নিয়ে ঘর জমাতে কতক্ষণ। কিন্তু তা হবার নয়। সবাই হার মেনেছে, মনের আর সে ঢিলে ভাব নেই বনলতার প্রতি, বিশ্বাস করে না আর পিসী তাকে। মুখেই ফুটোফুটি,

কথায় বেলা তো দেখা যায় গোবিন্দের একটু দর্শন লাভই যেন ছুঁড়িকে পাগলকরে।

সময়ে সময়ে গুলিয়েই যায় পিসীর কাছে গোবিন্দের মত বনলতাও। কারুরই কোন ধারা ধরা পড়ে না। সব যেন কেমন।

পিসী জবাব দিল না বনলতার কথায়।

বনলতা জিজ্ঞাস করল, পিসী কোথা চললে?

—যমের দক্ষিণ দোরে।

—ছি, ছি, তা কেন যাবে। বলে গম্ভীর গলায়, কিন্তু হাসে মুখ টিপে। আবার বলে, সামনে তোমার সুদিন, ভাইপোর বউ আনবে, শুয়ে বসে খেয়ে আরাম করে মরবে।

বড় খুশি হয় পিসী, বড় আনন্দ পায়। কথাতেই তার আনন্দ, জীবনের এইটুকুই সম্বল। এইটুকুই যে তাকে বনলতা ছাড়া আর কেউ দেয় না। সেই জন্যই তো বনলতার প্রতি পিসী কঠিন হলে নরম হতে দেরি লাগে না বেশি। হতে পারে ডাইনী, কথাগুলো তো ভাল বটে। বলে, ফুলচন্দন পড়ুক তোর মুখে, মরবার আগে আমি যেন তাই দেখে যাই; কিন্তু এ ছোঁড়ার ধম্মোজ্ঞান যেন রোগ, না-সারবার ব্যামো গো। সেই এসে ছোট্টবেলাটি থেকে দেখছি এই ধারা।

কিন্তু বনলতা তো জানে গোবিন্দকে। সাধক গোবিন্দ, নিষ্ঠুর গোবিন্দ, কি এক প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে টানছে তাকে। ধর্ম আর জ্ঞান মিলিয়ে সে যে কিসের টান—তার হদিস জানে না বনলতা। শুধু বোঝে—পিসীর আর তার—তাদের সকলের থেকে বহু দূরে—এক দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত গোবিন্দ, যে পাথুরে বর্মের গায়ে বনলতার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা মাথাটা ঠোকর খায় বার বার, ক্ষতবিক্ষত হয় মাথাটা।

তবু পিসীর মনগড়া কথাই বলে সে হেসে, তা একটা সোন্দর কন্তে—

উল্টে কিছু দেখাও না ভাইপোরে? পিসী অমনি হাতের ন্যাতা ও বালতি রেখে বনলতার কাছে এসে, চোখদুটোকে বড় বড় করে বলে ফিসফিসিয়ে দেখে আসছি। টুকটুকে ছোট্ট এক কন্তে, পয়সাও দেবে মেলা, সচ্ছল মানুষের মেয়ে। দিনক্ষণ দেখে একদিন নেমন্তন্ন করব করব ভাবছি। হ্যাঁ, সে মেয়ে পারে বোধ হয় ভোলাতে মোর গোবিনেরে।

—কে গো? বনলতাও তেমনি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে।

চকিতে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল পিসীর চোখে। অমনি মুখখানি ভার করে সরে গিয়ে বলে, সব কথা শুনতে চাওয়া কেন বাপু? সে আমি মরে গেলেও বলব না।

—হ্যাঁ, সেই ভাল পিসী, সব কথা সবাইকে বলতে নাই। আমারই বা কি কাজ বাপু শুনে, অ্যাঁ?

চকিতে কি অদ্ভুতভাবে মুখ টিপে হেসে ন্যাকামোটুকু করে বনলতা, সাধ্য কি পিসী টের পায় একটুও।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। বলে পিসী বালতি নিয়ে ডোবার দিকে যেতে যেতে ফিরে বলল, ডোবাটার ধার যা পেছল হইছে, সঙ্গে একটুক আয়ত অতি।

বনলতা হাসল। ডোবার ধারে গেল সে পিসীর সঙ্গে। দিব্যি শুকনো খটখটে ডোবার ধার। নীচের ঢালু অংশটুকুও সিঁড়িকাটা।

পিসী বলল, রাজপুরের দয়াল ঘোষকে চিনিস তো? বুড়ো দয়াল? বনলতা বুঝল এ কিসের ইঙ্গিত। তবু সে মাথা নেড়ে চুপ করে রইল।

অনেক দ্বিধা কাটিয়ে পিসী বলল, সেই দয়াল ঘোষের নাতনির সঙ্গেই—বুঝলি? কথাবার্তা খানিক করে আসছি। বলিস নে যেন কাউকে।

না না। সে তো খুব ভাল কথা গো পিসী। হাসি চেপে বলে বনলতা।

বনলতারও একবার মনে হল, দেখাই যাক না একবার পরীক্ষা করে। গোবিন্দের পরীক্ষা হয়ে যাবে—মেয়েটিকে দেখে সে কি বলে।

গোবিন্দের পরীক্ষা? পরমুহূর্তেই যেন বজ্রাঘাতের মত শক লাগল বনলতার বুকে। ছি ছি, একি সে ভাবছে! গোবিন্দের পরীক্ষা! কোন্ পরীক্ষার বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আজও গোবিন্দ? সে তো বহু দূরে উদ্দাম ঝড়ের বেগে ডানা-মেলে-দেওয়া পাখী। কোথায় সে থামবে, আর কি নিশ্চয়তা আছে তার নাগাল পাওয়ার?

বাইরে থেকে হরেরামের হাঁক শোনা গেল,—কই গো, গোবিনের পিসী কোথা গেল?

—ঐ এসেছে মুখপোড়া। বোঝা গেল পিসী এই হাঁকের জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল। বলল, বস, যাই। বলে—সে টুকটুক করে দ্রুত নেমে গেল ডোবার ধারে।

বনলতা বলল, পেছল যে, অত তাড়াতাড়ি যেও না। বলে মুখে কাপড় চেপে হাসে।

—আর পেছল। গেলেই বাঁচি।

সরে এসে প্রাণভরে একটু হাসল বনলতা। তারপর বাড়ীর সামনে হরেরামের কাছে এসে দাঁড়াল।

হরেরাম একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে, উঠানের একধারে গুটিসুটি বসেছে। ক্লান্ত থমথমে মুখটা বের করে রেখেছে শুধু। কোটরে ঢাকা চোখ দুটো লাল টকটকে।

বনলতা জিজ্ঞেস করল, কি গো, অমন করে বসে আছো যে? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

—আর বল কেন লতাদিদি। ধুঁকে ধুঁকে বলল হরেরাম, শালার জর আর ছোড়তে চায় না গো। দু-দিন ধরে পেটে নাই কিছু। তার মধ্যে আবার—

—তো এলে কেন?

—এলাম, গোবিন বললে কি জন্যে নাকি ডাকছে ওর পিসী। ভ্যালা যন্ত্রণা এক হয়েছে মোর, ছাড়তেও পারি না, রাখতেও পারি না। বলে একের তাড়া সয় না, এর আবার—

কথা বলতে আরম্ভ করলে আবার জ্বরের ঘোরে কথা বলতেই ইচ্ছা করে হরেরামের।

বনলতা বলল, কি রাখা ছাড়ার কথা বলছ?

—ওই তোমার গে—গোবিনের জমি। বিরক্তি দেখা যায় জরো থমথমে মুখটায় হরেরামের। বলে, লাভ তো কিছু নাই—কিন্তু কি করব! তবু যা হোক—বিচালিটা মাস দুয়েকের খোরাকিটা হয়, কিন্তু সে দেখতে গেলে চলে না। ভাগে খাটি বাবুদের জমিতে, আর ছুই পশ্চিম থেকে এ্যাক্কেবারে পুবে যেতে লাগে গোবিনের মাঠে যেতে। একলা মানুষ পারি না। অথচ কাজের সময় চুপ করে বসে থাকাও তো যায় না। সেই আমার ছুটতেই হয়।

হরেরাম ভাগচাষী আধিয়ার। নিজের জমি নাই তার, ভূমিহীন চাষী। বংশপরম্পরায় এ অবস্থা ছিল না তার। বাপ মরার পরও কিছুদিন ছিল খালের ধারের সাত বিঘা জমি। কিন্তু এই নয়নপুরের আরও বহু চাষীর মত একদিন দেখা গেল—বাবুদের বাড়ীর সেই লাল কাপড়ের মলাটের মোটা মোটা রাক্ষুসে খাতাগুলোর পেটে হরেরামের খালের ধারের জমিটুকু লেখা হয়ে গেছে। সে যাওয়া যে কী ভীষণ, কি

সাংঘাতিক, তা নয়নপুরের ঘরে ঘরে জানা আছে। আজও জানছে, জানবে ভবিষ্যতে।

গোবিন্দের পিসী প্রথমেই হামলে পড়ে এসে।—বলি, দেখা নাই কেন, দেখা নাই কেন তোর আর—অ্যাঁ? কি করলি না করলি, ধান কেমন হল না হল—

বনলতা বলল: ওর যে জ্বর হইছে গো। আসবে কেমন করে?

—ও ঢঙের জ্বর ঢের দেখছি। পিসি গরম হয়েই বলে, গত বছর, ক আঁটি বিচুলি দিয়ে তো নিস্তার পেলি, আর যে বিচুলিগুলান্ রইল, তার কি করলি!

হরেরাম নিস্তেজ গলাতেই বলল, তার কি করব বল? একলা মানুষ পারি না। দরিদ্দের ঘর, পড়ে রইছে, খরচ হয়ে গেছে তেমনি।

—মরে যাই আর কি? ভেংচে উঠল পিসি। —মোর সোয়ামীও আধিয়ার ছিল রে, মোর সোয়ামীও ছিল। এমন ছ্যাচড়া বিত্তি দেখি নাই কভু। বিধেন তো বিধেন। ন্যায়ের কাম করে মানুষটা মরে গেল। দরিদ্দ তো কি, জোচ্চোরি করবে তাই বলে?

হরেরাম চুপ করে রইল। বনলতা বুঝল, হরেরাম গত বছরের বিচুলিটা গোলমালই করে ফেলেছে। তাই অমন অপরাধীর মত চুপচাপ। কিম্বা হয় তো গ্রাহ্যই করছে না পিসির কথায়।

কিন্তু এ চুপ করে থাকাতে পিসি দমল না। বলল, এবার আমি সেই বিচুলি চাই, নয়তো টাকা মেটাতে হবে হ্যাঁ, বলে দিলাম।

হরেরাম নির্বিকারভাবে বলল, ও নিয়ে আর গোলমাল কেন বাপু। ছেড়ে দাও না। এ বছর তোমার সব কড়ায় গণ্ডায় মেটাব।

—কিছু শুনবো না আমি। বলতে বলতে পিসি আবার গোবিন্দের প্রসঙ্গে চলে এল। —সেই হতচ্ছাড়াই তো যত গোলমালের রাজা।

দেখল না বলেই তো গেল! বলে চাষার ছেলে, কাস্তে কুড়োল না ধরলে এমনিই হয়। আমি কোন কথা শুনবো না। বজ্জাতেরা মজা পেয়ে খুব লুটছ, না?

হরেরাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নেও বাপু অসুখ শরীলে আর গালমন্দ শুনতে পারব না এখন।

—তা পারবি কেন? জমিতে এবার একটুকুন সারও তো দিসনি, না এট্টুখানি পাঁক, না গোবর। তবে কি তোর রূপ দেখে ভাগে দিয়েছি। রাগছিস, গালমন্দ শুনবি না?

—ঘাট হয়েছে বাপু, ঘাট হয়েছে। কাঁথাশুদ্ধ হাত দুটো কপালে ঠেকাল হরেরাম,—এই শেষ, আসছে বছর তোমরা অন্য কাউকে দেওগে জমি, ও আমি আর পারব না।

গোঙাতে গোঙাতে চলে গেল হরেরাম। এদিকে তার ওই কটি কথাতেই ঘৃতাহুতি পড়ল আগুনে। পিসি শুরু করল সারা উঠোনময় দাপাদাপি, গালাগালি আর শাপমন্যি। এ শাপমন্যি যদি সোজাসুজি কাজ করে, তবে হরেরাম নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘরে যেতে যেতে পথেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেছে।

আখড়ার খোল-করতালের ধ্বনির সঙ্গে নসিরামের বৃদ্ধ গলার গান শোনা গেল।....

জাগোহে জাগোহে, সখা, জাগোহে, প্রাণনাথ জাগো হে, বাল-নীলমণি জাগোহে, জাগাও জগৎ হে, জাগাও জগৎ, মনকৃষ্ণ হে, জাগাও ভক্তহৃদয় হে।

বনলতা ঢুকলো গোবিন্দের ঘরে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতগুলো বই। এলোমেলো বিছানা! ময়লা কাঁথা-বালিশটার কাছেই নেভানো প্রদীপটা যেন বুড়িয়ে-যাওয়া জীর্ণ কালো

তেলের গাদে আর কালিতে ঝুলে পড়েছে। তা সত্ত্বেও ঘরটা অপরিষ্কার মনে হয় না। সমস্ত ঘরটাতেই সাধকের গাম্ভীর্য যেন অবিচলভাবে ফুটে রয়েছে, যেখানে বনলতার প্রবেশ খানিকটা অনধিকার বলে মনে হল। আশ্চর্য, এ ঘরে ফুলের গন্ধও আছে, ঠিক তাদের বালকৃষ্ণের ঘরের মতই নির্মল আর পবিত্র গন্ধ।

বনলতা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে দু-একটা বইয়ের গায়ে একটু হাত বুলায়, অক্ষর তো সে চেনে না। এ যেন গোবিন্দের সাধনার বস্তুগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে গোবিন্দের মনটাকে স্পর্শ করার বাসনা। সে যেন জানতে চায়, এ ঘরের আত্মাটার সঙ্গে যোগাযোগের পথের নিশানাগুলো কোথায়, তার সাধনা যেন এ ঘরের সঙ্গে একাত্মবোধের সাধনা।

জীবনের এ গতি পালটানোর দিনক্ষণগুলো মনে নেই লতার। কিন্তু এটা খানিকটা সে বুঝতে পারছে, জীবনটা তার গতি পাল্টে অন্য কোন দিকে চলেছে। বোধ হয়, ঝড়ের বেগে সেই ডানা-মেলে-দেওয়া পাখীটার মত, সেও অসীম শূন্যে গন্তব্যহীন কোন একটা পথের শরিক হয়ে পড়েছে। সে জানে না, এ ঝড় তাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবে, ভেড়াবে কোন্ কিনারায়। অনিশ্চয়তার পাড়ি জমিয়ে আজ আর বুঝি ফিরে যাওয়ার উপায় নেই বনলতার। বুকের অদৃশ্য ঝড়ে ডালপালা কাঁটা অনুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে, তবুও একেবারেই অপরিতৃপ্ত জীবনের এই যেন শান্তি, এই ঘরের বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোকে হাত বুলানোও একটা তৃপ্তি।

অথচ এক এক সময় বনলতা কি দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, জীবনটাকে দু হাতে দলে মুচড়ে ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলতে, তছনছ করতে। কেন না, সে তো চায় আসুক জীবনের দুঃখ পীড়ন নিষ্পেষণ। ভাঙুক ঘর, পড়ুক জল, ভাঙুক বাঁধ, ডুবুক মাঠ, ফাটল ধরুক মাঠে জ্যৈষ্ঠের রোদে আর

নিঃশ্বাসে, আসুক তার এই বিস্তৃত গর্ভ থেকে নাড়ী ছিঁড়ে খুঁড়ে সন্তান ; আসুক জীবনের পথে জমা সব সংকট, সব দুঃখ, সব অপমান, ক্লেশ, সবই বুক পেতে নেবে, বনলতা ; সব সব সব, বনলতার সমস্ত বলিষ্ঠ দেহ দিয়ে সে সব নেবে, ঠেকাবে, ক্ষয় করবে নিজেকে পলে পলে।

কিন্তু হায়, কালনাগিনীর বিষাক্ত মসৃণ গা থেকে জীবনের সে রূপটাই যে ঝরে যায় বার বার। জীবনের সেই খোলা সংগ্রামের দিকটা এল না তার। শিউরে উঠল বনলতা। দু-হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরে অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে সে চোখ দিয়ে লেহন করল নিজের দেহটাকে। ইচ্ছে করল, প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এখুনি আছড়ে শেষ করে দেয় ঘরের মেঝেটাতে। বড় অসহ্য হয়ে ওঠে এক এক সময় তার প্রাণটাকে জড়ানো রং-বেরং-এর ইন্দ্রিয়গুলোর বিচিত্র খেলা। ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে ঘরের মাচাটা ধরে ঝুলে পড়ে, ধ্বসিয়ে দেয় ঘরটা, ভেঙে ফেলে তছনছ করে।

হ্যাঁ, এমনি তার জীবনের ঝড়ের বেগ, এমনি অসহ্য হয়ে ওঠে।

অহল্যা ইতিমধ্যেই ভাত নামিয়েছে উনুন থেকে। ভরত আজ সদর কাছারীতে যাবে। মামলার দিন আজ। এ-রকম মাঝে মাঝেই সে যায়।

গোবিন্দ ঢুকে অহল্যাকেই জিজ্ঞেস করল, মহী কই বৌঠান?

অহল্যা ফ্যান গালতে গালতে আগুনের আঁচে লাল মুখটা টিপে হেসে বলল, কেন, ঘুম হয় নাই বুঝিন্ কাল রাতে?

না হওয়ারই সামিল, বৌঠান। দেওর তোমার ভাল আছে তো?

ভাল কি মন্দ বলতে পারি না। তারও তো তোমারই মত রাত কেটেছে। যাও, সে তার ঘরে কাজ করছে, দেখ গে।

গোবিন্দ বুঝল, মহিম সুস্থই আছে। সেদিকে তাড়াতাড়ি না করে সে জিজ্ঞেস করল, তা তোমার রাত না পোহাতেই ভাত নামল যে?

সদরে যাবে আজ মহীর দাদা। খানিকটা উৎকণ্ঠা দেখা দিল অহল্যার মুখে চোখে। এ মামলা করেই সব যাবে দেখছি। কাল সারা রাত ঘুমোয়নি মহীর দাদা। সকালে উঠেও থম্ ধরে বসেছিল। এই এখুনি নাইতে যাবার আগে বলে গেল, এবার মামলায় যদি হারি বড় বউ, মাঠে নামতে হবে নাঙল নিয়ে।

এতে অহল্যার দুঃখ নেই। দুঃখ তার ভরতের বিভ্রান্তিতে। যে আভিজাত্যের বীজ ভরতের বাবা চাষী দশরথ বয়ে এনেছিল এ ভিটেয়, সেই বীজেরই মহীরুহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ভরতের মনে। মাঠে নাঙল দিতে ভরত দুঃখ পাবে, মুখে নাকি তার কালি পড়বে, সম্মান হবে ক্ষুণ্ণ।

তাই অহল্যার বাপ-ভাই ভরতের বাড়িতে আসতে সংকোচ করে, জামাই তাদের ভদ্রলোক। তাদের ঘর-দোরে বিছানায় মাঠের ধুলো, গায়ে মাথায় পায়ে মাঠের ধুলো, তারা মাঠের চাষী। অহল্যার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হয়নি, জাতটাই পালটে গেছে খানিক। হ্যাঁ, ভরতও কোন দিন শ্বশুরবাড়ির লোককে তেমন তোয়াজ করেনি আর তা কেবল ঐ মিথ্যে ভদ্রলোকী আভিজাত্যের জন্য।

অথচ অহল্যা তো চাষীর ঘরেরই মেয়ে। বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছে সে জন্মের পর থেকে। কিন্তু ভরত আজ বিভ্রান্ত।

কিন্তু গোবিন্দ সম্পূর্ণ অন্য রকম ভাবল। দুনিয়াব্যাপী মানুষের এ স্বার্থান্ধ রূপটা তার মনকে কালো করে। এইটুকুই কি জীবনের পরিধি—এই স্বার্থ আর হানাহানি? এই মামলা আর মারামারি, দৈনন্দিন জীবনের সুখটুকু কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য কামড়া-কামড়ি। মানুষের পবিত্রতম প্রার্থনারত চেহারাটা তো সে কখনও দেখতে পায় না! মানুষের জীবন, তার ধর্ম, তার ধর্মের ইতিহাসের নেই কোন খোঁজ। যে ঈশ্বরকে ঘিরে আর নিয়ে মানুষের জগৎ সে ঈশ্বরকে এমন দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে দূরে দাঁড়ানোর এ জঘন্য শিক্ষা মানুষ কোথা থেকে পেল? কেন পেল?

সে জিজ্ঞেস করল, আজই বুঝি রায় বার হইবে?

না, আজ নয়। তবে দেরিও নাই আর।

মেজিস্টর বিচার করবে বৌঠান, তবে মহেশ্বরেরই হাত সবকিছুতে। তুমি তাঁকে ডাকো।

তাঁকে তো রাতদিনই ডাকছি ভাই!

যেন ডেকেও কিছু হল না। গোবিন্দ আঘাত পেল অহল্যার কথায়, ধমক দিতে ইচ্ছে করল অহল্যাকে।

মনে মনে ভাবল, তোমরা কোনদিনই ডাকনি। ছবি আর মূর্তি পুজো করেছে কেবল তোমরা, দেবতার নাম করে খেয়েছ গোগ্রাসে খাদ্য-অখাদ্য, কিন্তু সেই একক মহেশ্বরকে জানবার চেষ্টা তোমরা কেউ করনি। তার রূপ দিয়েছ কোটি কোটি, গল্প বলেছ হাজার রকম, তোমরা মজে আছ জীবনের ঘৃণ্য পাঁকে। মহেশ্বরকে ডাকলে না, তার কাছে চাইলে ধান, জমি, অর্থ, ঐশ্বর্য, সুখ-শান্তি। অথচ মহেশ্বরেরই সৃষ্টি এরা। বিচিত্র মহেশ্বরের সৃষ্টি।

কিছু না বলে সে চলে গেল মহিমের কাছে।

মহিম তো তখন পাগল। অন্য জগতে চলে গেছে। উন্মত্ত ক্ষিপ্ত শিবের মূর্তির গা থেকে মাটি খুঁটে খুঁটে তুলছে, ভরছে, কখনও সামনে যাচ্ছে, কখনও পেছিয়ে আসছে, কখনও মাথা নাড়ছে, অস্ফুট শব্দ উঠছে মুখ থেকে। কখনও মুখে ফুটছে হাসি, কখনও গম্ভীর, কখনও-বা একেবারেই স্থাণুর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ছে।

আছে সর্বক্ষণের একজন মাত্র দর্শক। সে হল কুঁজো কানাই মালা। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, পিঠে মস্ত বড় একটা কুঁজ। সেই কুঁজের ভারে সে অনেকখানি নত হয়ে পড়েছে। ফলে, হাত দুটো সব সময় বাতাসে দোল খাওয়ার মত দোলে। ঘাড় উঁচু করতে কষ্ট হয় বলে চোখের মণি দুটো উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে তার। কুঁজো কানাই মালা! গাঁয়ের শিশুদের কল্পনারাজ্যের বীভৎস পথে তার গতি। অশান্ত দামাল শিশু কান্নায় বাধা না মানলে কুঁজো কানাইয়ের নাম ধরে ডাক দেয় মা, যেমন ডাকে জুজু বুড়িকে। বয়স্কদের কাছে সে জন্তুবিশেষ, ভয়েরও বটে। নয়নপুরের মেয়েমানুষ কাউকে শাপ-শাপান্ত করতে হলে বলে, আর জন্মে তুই কুঁজো কানাই হবি।

পুরুষ হিংসার্দেবে মেয়েমানুষের কাছে কুঁজো কানাই যে এক মস্ত বিভীষিকা! অভিশপ্ত কুঁজো কানাই।

কিন্তু মূর্তি গড়ার সময় মহিমকেও ছাপিয়ে ওঠে তার পাগলামি। ঠেলে-ওঠা চোখ দুটোতে তার কী গভীর উত্তেজনা, আর সমস্ত রুক্ষ, শক্ত পেশীবহুল চেহারাটা যেন আবেগে থরো থরো। কখনও ঘাড় এদিকে কাত করছে, কখনও ওদিকে, কখনও এদিকে যায়, কখনও ওদিকে। যখনই তার মনোমতটি হচ্ছে তখনই একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

সত্য কথা, শিল্পীর হাত আজ কিছুটা বাঁধা পড়েছে কুঁজোর আবেগ-ভরা দৃষ্টির মাঝে। মহিম তার এই সৃষ্টি-সঙ্গীর যাচাইয়ের চোখকে আজ আর অবহেলা করতে পারে না। কাজ করে আর জিজ্ঞেস করে, বল তো কানাইদা, কেমনটি হইল?

কুঁজো কানাই তার কুৎসিত মুখে বিচিত্র হাসি নিয়ে বলে, ভাল। কিন্তুক—

শিল্পীর পরের কাজের দিকেই ঝোঁক তার বেশি! অর্থাৎ, এর পর কী হবে?

গোবিন্দ সাধক, কিন্তু মহাশক্তির। তার কোন নাম নেই, নেই মূর্তি। তার ধ্যান ধারণা শক্তিরই উপাসনা, কিন্তু উপচারবিহীন। তবু প্রেমিক, উন্মত্ত শিবের যে মূর্তি মহিম গড়ছে তা তাকে মুগ্ধ না করে পারল না। যে হাতে শিব সতীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরেছে, যে ঘৃণা ও দৃঢ়তা শিবের মুখে ফুটে উঠেছে, এই উভয় ভঙ্গির পার্থক্য গোবিন্দের সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে দিল। হাতের দিকে তাকালে মনে হয়, মৃত প্রিয়াকে কী আকুল আবেগেই আঁকড়ে ধরেছে। যেন ঐ হাত থেকে জগতের কোন শক্তিই প্রিয়াকে ছিনিয়ে নিতে পারবে

না। আর ত্রিনয়নের সেই অগ্নিদৃষ্টির মধ্যে গোবিন্দ দেখল, কোথায় যেন অশ্রুর বাষ্প জমে উঠেছে। আহা! শেষে তার সমস্ত আবেগ জমে উঠল বন্ধুর প্রতিভার প্রতি; মহিমের এই গভীর অনুভূতি ও দৃষ্টির তল খুঁজতে সে আকুল হয়ে ওঠে। হাঁ, মহিমের প্রতি তার বন্ধুত্বের যে টান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, সে বুঝি তার এই আকুলতা, মহিমের হাত আর চোখকে এতখানি শক্তি ও দৃষ্টি দিয়েছে যে মন, সেই মনটাকে স্পর্শ করার আকুলতা।

সে ডাকল, মহী!

জবাব পাওয়া গেল না। তখন মহিমকে ডাকা বুঝি ঐ মাটির মূর্তি ক্ষিপ্ত শিবকে ডাকারই সামিল। একটা মস্ত দোমড়ান গাছের গুঁড়ির মত ফিরে ইশারায় ডাকতে বারণ করল কুঁজো কানাই। তারপর গোবিন্দের একটা হাত ধরে খানিক দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার মাথাটা হাত দিয়ে ধরে নিজের মুখের কাছে নামিয়ে নিয়ে এল কানাই। কয়েকটা দাঁতে বিচিত্র হেসে ফিসফিস করে বলল, শ্মশানের বেবভোম। নইলে মায়ের এমন খুনে বাপের বাড়িতে আসতে কেন সাধ হইবে, বল?

কুঁজোর কথার ধারা ধরতে পারল না গোবিন্দ। বলল, কি বলছ?

ওই গো, তোমায় দক্ষ রাজার মেইয়ের কথা বলছি। সতী মায়ের কথা। বলে সে তার ঠেলে-ওঠা চোখ দুটো দিয়ে শিবের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাং-গ্যাঁজার মানুষ তুমি ঠাকুর, মায়ের লীলা দেখে ভুললে। আমি হইলে—

কথা শেষ না করে সে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল। গোবিন্দের বড় ভাল লাগল কুঁজো কানাইয়ের এই সরল হৃদয়ের আফসোস। জিজ্ঞেস করল, তুমি হইলে কী করতে?

মুই ? কানাইয়ের কালো কুব্জ দেহ ঘৃণায় যেন সোজা হয়ে ওঠার জন্ত কেঁপে উঠল। সমস্ত চোখ মুখ দারুণ ক্রোধের অভিব্যক্তিতে উঠল থমথমিয়ে। মুই হইলে, অমন শউরের ঘরে বউ পাঠাইতাম না। হঁ, হক কথা বললাম। দু-দিন উপোস করে আড়ি দিত বউ, তবু—

গলা বন্ধ হয়ে এল কুঁজো কানাইয়ের। গোবিন্দ দেখল তার ঠেলে-ওঠা চোখ দুটোতে দু-ফোঁটা জল চক চক করছে। হায়! তবু এই বিকটদর্শন কুঁজো বউ নিয়ে ঘর করা দূরের কথা, জন্মাবধি গর্ভধারিণী মা থেকে শুরু করে কোন নারীর মিষ্টি কথাও শোনেনি। তার বুকে আজ গুমরে ওঠে কান্না শিবের বউ সতীর বিরহে। আশ্চর্য জগৎ। তার চেয়েও আশ্চর্য জগতের মানুষ। সাধকের সাধনায় জমে-ওঠা মস্তিষ্কে যেন টঙ্কার পড়ে। মানুষ! মানুষকে তার পুরোপুরি চিনে ওঠার মধ্যে কোথায় যেন মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। সে ভীত হয়, যখন তার নিরাকার ঈশ্বর সাধনা এমনি কোন মুহূর্তে চমকিত হয়। সেও তো মানুষ। কুঁজো কানাইও মানুষ। তবু মানুষের সমাজ তাকে মানুষ বলে মানতে বাধা পায়। অথচ কুঁজো কানাইয়ের আবদার আর দশজনেরই মত। আর সেই মানুষের সঙ্গে তার সাধনার যেন এক মস্ত গরমিল। মানুষ তার কাছে বড় কিঞ্চিৎ। ... না না, মানুষের জন্ত তো সে মঙ্গল কামনা করে দিবারাত্রি তার ঈশ্বরের কাছে। মানুষ তো তাঁরই সৃষ্টি, সেই তাঁর সাধনার চেয়ে মহিমময় আর কি থাকতে পারে!

তবু কুঁজো কানাইয়ের এ বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা তার পরমেশ্বরের কাছে এক বিচিত্র প্রশ্নের মত ছোট্ট একটি দাগ কেটে রাখল মনের কোণে।

সে দেবতার বহুরূপ ও তার জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্ত বলল কুঁজো কানাইয়ের কুঁজের উপর আলতো

করে একখানি হাত রেখে, এ তো দেবতার লীলা ভাই কানাইদাদা, এর জন্ম তুমি দুঃখ কোর না।

কিন্তু এ কথা মানবার পাত্র নয় কুঁজো কানাই। গোবিন্দর মানুষ না-চেনার হাল্‌কা দুঃখতে যেন দারুণ বিদ্রূপ করেই কুঁজো কানাই আচমকা গর্জনের মত চিৎকার করে উঠল, না না না, কক্ষনো নয়।

সে চিৎকারে মহিমের সম্বিৎ ফিরে এল। ফিরে দেখল, বন্ধু গোবিন্দ অপ্রতিভ শঙ্কিত মুখে কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কুঁজো কানাই দুর্নিবার বেগে মাথা নেড়ে চলেছে। বুঝি ঘাড়টাই ছিটকে পড়বে ধড় থেকে, এতই তার বেগ। ছিটকে পড়ছে লাল তার মুখ থেকে।

মহিম হাত ধরল কুঁজোর। জিজ্ঞেস করল, কি হইছে কানাইদা?

কানাই তার ঠেলে-ওঠা রক্তবর্ণ চোখে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, এটারে কয় বেব্‌ভম্‌, হাঁ, তোমার দেবতার বেব্‌ভোম।

—বেব্‌ভোম্‌? আশ্চর্য! গোবিন্দের চাপা-পড়া গলা কেঁপে উঠল।

—লয়? বিকলাঙ্গ কানাই চকিতে যেন খ্যাপা জানোয়ারের মত হয়ে উঠল। বুঝি বা ঝাঁপিয়ে পড়বে গোবিন্দের উপর। তবে তোমার মুনি দেবতার এত বিবাদ কেন, জগতে এত দুঃখক্‌ কেন গো? কালু মালার সোন্দরী টুকটুকে মেইয়ে বুড়ো ভাতারের ঠ্যাঙানি রোজ খায় কেন?

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে গিয়ে বুনো মোষের মত ফিরল কুঁজো কানাই। জিভ্‌ দিয়ে লালা চেটে নিয়ে বলল, তোমার সবার বড় ভগমানের বেব্‌ভোম যদি না হইবে, তবে মোরে কেন জন্ম দিল সম্‌সারে?

বলতে বলতেই তার নিষ্ঠুর চোখ ছাপিয়ে হু হু করে জলের ধারা বইল। বলল কপালে চাপড় মেরে, এ কি লীলা তোমার ভগমানের, এ কি খেলা মোরে নিয়ে?

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল সে হাত ঝুলিয়ে, তেমনি তীব্র বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে। আর ছুচলো কুঁজটা যেন ক্লান্ত জানোয়ারের পিঠে নিশ্চল নিষ্ঠুর সওয়ারের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তার তীব্র মাথা নাড়া যেন জগৎটাকেই অস্বীকার করার অনিরুদ্ধ বেগ।

ত্রস্ত অহল্যা এসে দাঁড়াল। মহিম ও গোবিন্দকে নির্বাক দেখে বলল, কি হইল, কুঁজো মালা অমন খেপল কেন?

গোবিন্দ বলল, ওরে আমি দুঃখুক দিইচি। কিন্তুক অজানিতে।

সকাল থেকে অহল্যার মন ভার। তবু একটু হেসে বলল, একেরে সামলানো দায়, তায় তিন পাগল একত্র হইছ। দেখো বাপু, মাথার চালটাকে ভিটেয় ফেল না।

বলে দরজার কাছ থেকেই সরে গেল সে।

মহিম বলল, ওরে দুঃখুক দেওয়া তো বড় চাট্টিখানি কথা নয় গোবিন। তবে ঈশ্বরের গুণের কথায় ও বড় খ্যাপা। তাই বুঝিন্ বলছ?

—আমি বুঝতে পারি নাই মহী ভাই।

তার ঠোঁটে কান্নার আভাস দেখা দিল। বনলতার নিষ্ঠুর সাধক আর সবার কাছে, সব কিছুতে বড় নরম। মনটা তার তুলোর মত। রোদে হাওয়ায় ফোলে, জলে নেতিয়ে যায়। টানলে বাড়ে, টিপলে গুটি মেরে যায়। পরমেশ্বরের দিকে ছুটে চলার সাধনাটা যেন তার বালিশের খোলের বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নেওয়া যেখান থেকে কেউই তাকে টেনে বার করতে পারবে না।

মহিম তাড়াতাড়ি বলল, বুঝেছি বুঝেছি।

ব্যাপারটাকে হালকা করে দেওয়ার জন্য বলল, তা তুমি হঠাৎ আসলা যে সকালবেলা?

—কাল রাতে তো তুমি যাও নাই? ভাবলাম বুঝি—

—সে এক কাণ্ড গোবিন ভাই।

কাল রাতের কথা মনে, হতেই সব কথা গোবিন্দকে বলার জন্য প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল মহিমের। বলল, কাল একটু বাবুদের, মানে, ওই জমিদার বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কাণ্ডখানা বড় তাজ্জবের।

সে বলে গেল সব কথা। প্রতিমা গড়ার কথা, হেমবাবু ও উমার মত দুইজন বিচিত্র অপরিচিত নরনারীর কথা। কি তার মনে হয়েছিল, কেমন করে তারা কথা বলেছিল। হ্যাঁ, সেই নাম-না-জানা গদীটাতে বসবার কথা পর্যন্ত সে বলে গেল গোবিন্দকে। উমা যে পাগলা বামুনের সহপাঠিনী, সে কথাটিও বলতে ভুলল না সে। তারপর কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত বন্ধুকে বলল, সে কেন প্রতিমা গড়তে চাইল না। নিজের অনিচ্ছার কথা নানানখানা বলে সে শেষে বলল :

—আর তা কি আমি পারি গোবিন ভাই? অর্জুন পাল মশাই চিরদিন বাবুদের পিতিমে গড়ে আসছে। আর পালমশাই আমার গুরুজন। ছোটকাল-থে তার কাজ দেখেই যে প্রাণে আমার সাধ হইছিল। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি আর আমার গুরু তো জানি। পাল পাড়ায় যে আমার কত মান। আমি কি তা পারি?

এত কথাতেও গোবিন্দের মুখের কোন ভাব পরিবর্তন না দেখে বলল মহিম, শরীল কি তোমার খারাপ হইছে?

গোবিন্দ বলল, না, মনটা বড় খারাপ হইছে মহী ভাই। তবে তুমি পিতিমে গড়ার ভার না নিয়ে ভালই করছ। অন্যান্য কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, সন্ধ্যেবেলায় আসছ তো? আমি এখন যাই। এসো কিন্তু।

সাধকের মগজে কানাই কুঁজোর শেষ কথা প্রচণ্ড কলরব তুলে দিয়ে

গেছে। বেব্‌ভোম্‌ যদি না হয়, তবে মোরে নিয়ে ভগমানের এ কি খেলা! ভগবানের বিভ্রম! তা হলে ভগবান ভগবান কেন?

যেতে যেতে হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলল, হ্যাঁ, বনলতা তোমারে ডাকছে।

—মোরে? মহিম বলল, তার সঙ্গে তোমার দেখা হইছে?

চকিত কুণ্ঠায় মুহূর্ত চুপ থেকে গোবিন্দ বলল, হ্যাঁ। যেয়ো কিন্তু, নইলে মোরে জ্বালাতন করবে।

মহিমের ঠোঁটে চকিতে এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল।

পথে যেতে যেতে গোবিন্দের মাথায় হঠাৎ ভাবনা এল, সকালের এ বিভ্রাট কি তবে প্রভাতে বনলতার দর্শন!

(৯)

মহিম তার কাজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বেরোবার উপক্রম করতেই হঠাৎ আবার অহল্যা এসে ঢুকল। মহিমকে সব গুছোতে দেখে অহল্যা ভ্রূ তুলে গম্ভীর মুখে বলল, একজন তো মামলা লড়তে বের হইলেন। আর একজনের নিশানা কোন্ দিকে?

মহিম বলল, দেখি একবার কুঁজো মালা গেল কুনঠাঁই। আর যাব একবার লতার ঠাঁই।

তাই ভাল, বাঁকা ঠোঁটে হেসে রহস্য করে বলল অহল্যা, কাল বলছিলে রাতে, কোন্ এক অপরূপ সোন্দরী নাকি দেখে আসছ। মুখ নাকি তার তোমার-গড়া বুদ্ধদেবতার মত মিষ্টি। ভাবি, বুঝি রাত পোয়াতেই সেই মুখের খোঁজে চলল।

সহজ জবাব না দিয়ে মহিম বলল, কেন, আমাদের ঘরের বউ বুঝিন্ কুচ্ছিত?

—পোড়া কপাল অমন সোন্দরের!

কথা বলতে গিয়ে কথা আটকায় বুকে অহল্যার। বুকের মধ্যে কোথায় যেন কিসের এক ত্রাস জমিয়ে বাসা বাঁধে। কথা নয়, যেন চোরাবালুতে সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছে। মুহূর্তের এদিক ওদিকে বুঝি চিরদিনের জন্য তলিয়ে যেতে হবে বসুমতীর গর্ভে।

হেসে তেমনি রহস্য করে বলল, নিজের জন্য একটি খুঁজে আনতে হবে তো। না, কি চিরদিনই ভায়ের বউয়ের মুখ দেখে চলবে।

চলিছে না নাকি! তা যা-ই বল, ও পরের মেয়ের ঝামেলায় আর যাচ্ছিনে বাপু।

আমি বুঝি পরের মেয়ে নই?

তুমি? মহিম চোখ তুলল। অহল্যা তার তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টি চকিতে নিল সরিয়ে।

মহিম বলল, সে কথা মোর মনে লয় নাই কোন দিন। তুমি আবার পরের মেয়ে হলে কবে? তুমি যদি পরের মেয়ে, তবে আর মোদের আছে কে?

কশাঘাত নয়, তবু যেন কিসের আচমকা আঘাতে অহল্যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই মুখে হাসি টেনে নিজেকে মনে মনে গাল দেয় সে, মুখপুড়ি, পাষাণী আর কি শুনতে চাস তুই এ নরম মানুষটার কাছ থেকে? বলল, হঁ্যা, মোরে ছাড়া তো তোমাদের জগৎ সংসার খাঁ খাঁ করতেছে।

পরের কথা নয়, মোর কথা বল। শুনি, জন্ম দিয়ে মা মরেছিল, বাপকেও মোর মনে নাই। দাদা হল অন্য মানুষ, তার মনের তল পাই না। তোমার মনের হদিসও আমি হারিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে। তবু, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সেই ছোটকালে তোমারে যদি না পেতাম,. তবে বুঝিন জ্যান্ত থেকে এত বড়টা হইতাম না।

চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে অহল্যা দু-হাতে মহিমের মুখে হাত চাপা দিল। থাম—থাম, খুব হইছে মোর মসকরা। এ কি কথার ছিরি?

তারপর তার সমস্ত হৃদয়কে মুচড়ে দিল মহিমের চোখের দু-ফোঁটা জল। মহিমের এক মাথা চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে অহল্যা চোখে

জল নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, মস্‌করা বোঝ না বাপু তুমি। বড় নরম মানুষ।

চোখ মুছে মহিম বলে, আর তুমি বুঝিন্‌ পাথরের? তবে পাথরের চোখে জল কেন? পর বলে বুঝিন্‌?

নেও হইছে, কোথা যাচ্ছিলে যাও। দেখ, বেলাটুকুন কাটিয়ে আস না যেন।

আসি আসব, তুমি বসে থেকো না, বলে মহিম বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য! অহল্যার ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। চোখ পলকহীন। সে দৃষ্টি, সে হাসি সুখের না দুঃখের, কিছু চাওয়া না পাওয়ার—তা বুঝি সে নিজেই জানে না। তারপর আরও আশ্চর্যতর, যখন আচমকা দমকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ফুলের পাপড়ির মত কেঁপে উঠল তার ঠোঁট, চোখে ছুটে এল বন্যা। অদমিত তার বেগ। কেন?

এ কি সেই তার নিজের হাতে বাঁধা বীণার তারে বেসুর?

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

মহিম সারা নয়নপুর ও তার আশেপাশে আতিপাতি করে খুঁজল কুঁজো কানাইকে। কিন্তু কোথাও দেখা পেল না তার। না, এতে নয়নপুরের বুকে কোন দুশ্চিন্তা, তার চলতি জীবনে কোন ব্যতিক্রমই দেখা দেয়নি। শুধু মহিমের ঘুচেছে নাওয়া খাওয়া, চোখে মুখে অনুক্ষণ দুশ্চিন্তা, বুকের মধ্যে এক অজানা শংকা তাকে বড় মুষড়ে দিয়েছে; কুঁজো কানাইয়ের প্রাণের হদিস্ তো আর কারুর জানা নেই। সকলের চোখে সে জানোয়ারের সামিল। জানোয়ারের আবার প্রাণ কিসের! সত্য, কুঁজো কানাইয়ের কিছু নেই, তবু আর দশজনের হিসেবনিকেশ যে তারও হিসেবনিকেশ। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সব কিছুতে আর দশজনের চেয়ে তার প্রাণের বোধ যে আরও বেশি। তার প্রাণের শিশু-বৃদ্ধের যুগপৎ বিচিত্র খেলা আর কেউ না জানুক, মহিম তো জানে। আর জানে বলেই তার উৎকণ্ঠা।

মালাপাড়ার নামকরা সুন্দরী মেয়ে সে কালু মালার মেয়ে। টাকার লোভে কালু মেয়ে দিয়েছিল ঘাটের-দিকে-এক-পা-বাড়ানো এক বুড়োকে। তাইতেই কুঁজো কানাইয়ের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মহিমকে এসে বলেছিল, পিশাচ শুধু নয়নপুরের শ্মশানেই থাকে না, ঘরেও থাকে।

এই ক্ষোভই একদিন ফেটে পড়েছিল কুঁজো কানাইয়ের—যেদিন চোখের সামনে দেখল, সেই মেয়েকে তার বুড়ো সোয়ামী এলোপাথারি পিটছে। ছুটে এসে তার সেই মস্ত হাত দিয়ে বুড়োকে সাপটে ধরে সে

ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উঠোনে, বুড়ো হারামজাদ, তোর ওই নৌকা-ধরা, ও পোড়া কাঠের হাতে ঠ্যাগাস্ কচি মেইয়াটারে। .... মালাপাড়ার মালারা সেদিন বেধড়ক মার দিয়ে বার করে দিয়েছিল কুঁজো কানাইকে।

কানাই এসে মহিমকে বলেছিল, মোরে বেড়ন দিলে, সেটা বড় নয়। মালাদের এ মতিগতি দেখতে এ ছার পরান আর রাখতে ইচ্ছা যায় না।

আর সেই হল মহিমের সবচেয়ে বড় ভয়। এসব পাগলেরা থাকে একরকম, কিন্তু বিগড়ে গেলে এক মস্ত সমস্যা। মানুষের মতিগতিতে যার নিজের প্রাণের স্বাদ বিস্বাদ, তাকে নিয়ে খেলা করেছে যে ভগবান, সেই ভগবানের বিভ্রমের প্রতিশোধ তুলতে যে সে প্রাণত্যাগ করে বসবে না তার ঠিক কি?

মহিম শিল্পী, কিন্তু হাত চোখ আর মন আজ বেয়াদপ ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বসল। হাতের মাটি হাতে রইল, প্রাণ রইল নিঃসাড়।

অবস্থাটা বুঝল মাত্র একজন। মহিমের সবকিছুই প্রতি প্রছিটি যে, ধরতে পারে—সে অহল্যা। যমুনার মত উপরে শান্ত, তলে তার খরস্রোতের তীব্র বেগ। অহল্যার হল তাই। সে ডাকল তার প্রিয় অনুচর মানিককে। বলল, যেখান থেকে পারিস্ কুঁজো মালার খোঁজ নিয়ে আয়। এ জগতে তো তোর কোন ঘাট-অঘাটের বেড়া নেই। এ খবরটা মোরে এনে দে বাবা, নইলে সোয়াস্তি নাই তোর কাকীর পরানে।

ব্যাপারটা বড় ছোট নয়। মানিক ছুটল কোমরে চিড়েগুড়ের পোঁটলা বেঁধে।

ভরত এসবের কোন খোঁজ রাখে না। সে একথা জানতে পারলে সামান্ত দরদ তো দূরের কথা, এ পাগলামিকে সে তার স্বাভাবিক বিদ্রূপ ও রূঢ় ভাষায় শাসনই করবে।

ঐ অবস্থায় পথ চলতে হরেরাম একদিন ডাকল মহিমকে। দুপুরে পড়ায়। উঠোন থেকে উঠে এসে হরেরাম ডাকল, মহিম নাকি গো?

মহিম ফিরল। বলল, কিছু বলছ হরেরামদা?

বলতে ভাই ইচ্ছে করে অনেক কথা। ঠিক বিরূপ নয়। কেমন যেন একটা চাপা আফ্‌সোস ফুটে উঠল হরেরামের গলায়। বলল, যেতে পারিনে কোথাও। জ্বর-জারিতে শরীলও বশ থাকে না। আর—

কথা শেষ করল না হরেরাম। মহিম দেখল কেমন বিতৃষ্ণায় ঠোঁট জোড়া কুঁচকে উঠেছে হরেরামের। বলল, আর কি বল?

তোমার দাদার ভিটেয় পা বাড়ীতে মনটা বড় ছোট হয়। নইলে গাঁ জোড়া যার এত নাম, একবার কি প্রাণে সাধ যায় না, তার হাতে গড়া কাজ দু-দণ্ড দেখে আসি?

কথাটি বড় সত্য। সেজন্য মহিমের শুধু লজ্জা নয়, ক্ষোভও বড় কম নেই। মামলাবাজ, রূঢ়ভাষী ভরতের উপর গ্রামের মানুষ, বিশেষ জাতভাই চাষীরা সকলেই মর্মাহত, ক্রুদ্ধ। বুঝি ঘৃণাও করে। মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় তিক্ত, জ্ঞাতিকে করে হেয়জ্ঞান। অথচ কিসের অহঙ্কারে, তা বোধ হয় ভরতই জবাব দিতে পারে না। এ কথা নিয়েই দাদা বউদি'র মাঝখানেও যেন এক মস্ত প্রাচীর উঠেছে খাড়া হয়ে।

তবু অনেকেই তো যায় মহিমের কাছে। কত মানুষকে মহিম হাত ধরে ডেকে নিয়ে যায় নিজের কাজ দেখাতে, কেউ আসে ডাকের আগে। এই নয়নপুর, ওপারে রাজপুর, আশেপাশে মহিম তো কোথাও পর নয়। মহিম বলল, আমার কাছে তো সকলেই যায় হরেরামদা।

যায়, সে তোর টানে ভাই।

নয় কেন? তা ছাড়া, ভিটে তো একলা দাদার নয়।

কথাটা বলে ফেলে বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল মহিমের। কেন

যেন তার মনে হল সে বুঝি চীৎকার করে লোককে তার অধিকারের কথা জানিয়ে দিচ্ছে, যেন ভরত বিস্মিত ক্রোধে বাক্‌হারা, তার দিকে তাকিয়ে আছে অহল্যা। না না, মহিম তো তাই ভেবে ওকথা বলেনি।

যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতন হরেরামকেই বলল সে, দশজন ছাড়া আমি নয় হরেরামদা। তোমরা কেবলি দাদার কথা বল, আমি কি কেউ নই?

হঠাৎ হরেরাম অত্যন্ত আপনভাবে বলে উঠল, আয় না কেন, খানিকটা বসবি।

মহিম দ্বিরুক্তি না করে ঢুকল বাড়িতে। যে ঘরে নিয়ে এল তাকে হরেরাম, সেখানে এসে চমকে উঠল মহিম। দেখল, গাঁয়ের চাষী, মালা, কামার সকলেই এসে সেখানটিতে ভিড় করেছে। রাজপুরেরও কেউ কেউ এসেছে। আশেপাশের গাঁগুলিও বাদ যায়নি। কি ব্যাপার! এমন একটা পরিবেশের কথা মহিম কল্পনাও করতে পারেনি। সকলেই তাকে বাবা, ভাই বলে ডেকে বসাল। এক কোণে অহল্যার বাবাকে বসে থাকতে দেখে মহিম উঠে গিয়ে প্রণাম করল। অহল্যার বাবা পীতাম্বর তাড়াতাড়ি মহিমের হাত ধরে বলল, থাক্ থাক্ বাবা, বেঁচে বর্তে থাকো, পায়ে হাত দিও না।

পায়ে হাত দিও না কথাটা অভিমানের। নিজের জামাই যাকে ভুলে কোন দিন নমস্কার করে না, তারই বিমাতার সন্তান প্রণাম করলে মনে আর লাগে না কার? তবু পীতাম্বর শুধু তুষ্ট নয়। মনে প্রাণে আশীর্বাদ করল মহিমকে আর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। মেয়ের মুখে তার এই দেবরটির অনেক কথাই শুনেছে সে তার মেয়ের বড় স্নেহের দেবর শুধু নয়—কথায় আঁচ করেছে পীতাম্বর, বুঝি বড় সোহাগের।

পীতাম্বরের কথার প্রতিবাদ করল দয়াল কামার। বলল, এ তোমার রাগের কথা পীতু ভাই। গুরুজনকে পেন্নাম করবে না। এ তোমার কোন্ শাস্তরের কথা?

ও সব শাস্তর ফাস্তরের কথা ছাড়, এখন কাজের কথা বল, নয় তো বল ঘরে যাই।

কেবল চেঁচানি নয়, কথাটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ধমকানির মত শোনাল। সকলেই তাকিয়ে দেখল বক্তা পীতাম্বরের বড় ছেলে ভজন। কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এতক্ষণের সমস্ত ব্যাপারটা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এবং এ ক্ষিপ্ততার বর্তমান কেন্দ্র মহিম হলেও আসলে ভরতই। শ্রীপতির সঙ্গে ভজনের সম্পর্কটা এমনই তিক্ত যে, অনেকদিনই তার ইচ্ছে হয়েছে ভরতকে পথে ঘাটে ধরে অপদস্থ করে দেয়। কিন্তু অহল্যা তার বড় আদরের বোন। ভরতের উপর আঘাত যে বোনের উপরে গিয়েই শেষ পর্যন্ত পড়বে এটা সে জানত, জানত বলেই নীরব। ভরতের জন্যই ভজন কোন দিন মহিমকে ডেকে কথা বলেনি। অহল্যার কাছে তার দেবরের গুণপনা শুনলেও রাগটা ভজন মনে মনে জমিয়ে রেখেছে, শত হলেও একই ঝাড়ের বাঁশ তো! আর চাষীর ছেলে কুমোর হল, তাও কি না শহরের লেখাপড়া জানা বাবুদের স্কুলে শেখা কুমোরগিরি। একটা ফারাক ভজন কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে মাটিতে চাপড় মেরে বলল, চাষী চাষীর পেন্নাম লেয়, আর কারুর লয়।

মহিম চকিতে ফিরে দু-হাতে ভজনের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল, দাদা বইসে আছেন, দেখি নাই।

ভজন দু-হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে কি একটা বলতে গেল, কিন্তু মহিমের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত স্তব্ধ রইল সে। ঘরের আর সবাই ভজনের

গোঁয়ারগনার কথা স্মরণ করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। না জানি ভজন কিছু ঘটিয়ে বসে।

হাত জোড় করে মহিম বলল, ঠিকই বলছেন দাদা, চাষীর পেয়াম চাষী নেয়, মোর তো অপরাধ নাই। এট্টু ঠাঁই দেন মোরে বসবার।

সকলেই জায়গা দেবার আগ্রহে নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ভজন মহিমের জোড় হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে নিল। বলল, বস বস ভাই, মোর ভুল হইছে। মানুষ তো বাঁশের ঝাড় নয়। মানুষ—মানুষই।

মহিম ছাড়ল না। ভজনকে আরও খানিক যাচাই করে নেওয়ার জন্যই বলল, চাষীর ছেলের মূর্তি গড়া কি অপরাধ দাদা? মাঠে লাঙল দেওয়া ছাড়া চাষীর ছেলে কি আর কিছু করবে না কোন দিন? মেলা লেখাপড়া শিখি নাই, কিন্তু যা করছি মোর সে সাধনা কি অন্যায়? আমি কি চাষীকুলের কলঙ্ক?

ভজন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছি ছি, সে কি কথা ভাই? তোমার নাম যে ঘরে ঘরে।

মহিম বলল, মোর কাজ দশজনার। আপনাদের জন্য আমি কাজ করতে চাই। বোঝা গেল, ঘরের সকলেই তুষ্ট হয়েছে তার কথায়। দয়াল কামার উঠে এসে মহিমের মাথায় হাত দিয়ে বলল, মুই আশীর্বাদ করছি, তুমি আরও উন্নতি কর বাবা, বেঁচে থাক। তুমি চাষীকুলের রত্ন।

সকলেই বলে উঠল, নিশ্চয় নিশ্চয়।

রাজপুরের জহীর মিয়া বলে উঠল, নইলে বাপজান মোর এক কথায় জমিদারের কথার পিতিবাদ করে আসল পিতিমে গড়তে পারবে না বলে।

শ্রদ্ধায় বিস্মিত সকলের চোখ গরীয়ান করে তুলল শিল্পীকে। মহিম বুঝল, এটা গাঁ ঘরে ভরতের ঢাক-পেটানো ঘটনা। উঠে হাত জোড়

করে বলল সে, পিতিবাদ নয় জহীর চাচা। যা মোর মন চায় না, তা আমি অস্বীকার করছি।

সেই হইল বাপজান, সেই হইল। সে হিম্মতই বা ক'জনার আছে?

কথাটা দয়ালের ছেলের গায়ে লাগল। সে ফুঁসে উঠল, আছে। আছে বলেই আজ হরেরামদা'র ভিটেয় সব একত্র হইছি।

জহীর হেসে বলল, কথাটা মোর ভুল বুইঝ না কামারের পো। জমিদারের সোহাগ আর চাঁদির লোভ সামলানো বড় চাট্টিখানি কথা নয়, বুঝলা? বাপজান মোদের সে পথ মাড়িয়ে দিয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা টিকটিকির টিক টিক শব্দের সঙ্গে একত্রে কয়েকজন মাটিতে টোকা দিয়ে বলে উঠল, সত্য সত্য সত্য।

অদৃশ্য টিকটিকির এ দৈব ঘোষণা যেন সমস্ত সত্যকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে গেল। এ ঘরের সমস্ত মানুষগুলোর কাছে ওই জীবটি ঈশ্বরের প্রতিনিধির মতনই।

মহেশ মালা বলল, আর তো দেরি করা যায় না হরেরাম, বেলা যে গড়ায় ওদিকে।

মহিম বলল, মোরে কি থাকতে হইবে হরেরামদা?

হরেরাম বলল, তা তো হইবেই ভাই। সকলের কাজ, সকলের কথা। জোড়া জোড়া মহকুমার চাষী-মনীষরা আজ একটা পিতিবিধেন করতে বসছে। তোমার কথা তোমারে বলতে লাগবে না? কেন, শরীলটা কি বেগতিক বোঝ?

শরীল না, মনটার বড় হুতাশ রইছে। কুঁজো মালা তার উপর গাঁ ছাড়া। সে বড় দুঃখু পেয়ে গেছে। যদি কিছু করে বসে—বলতে বলতে তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

হরেরাম হেসে উঠল। ও হরি, এই কথা।

সকলেই প্রায় উঠল হেসে। দয়াল বলল, এরেই কয় পাগল। পাগলে পাগলে কেমন জোড় বাঁধে দেখছ তোমরা! তা মোঁদের জিজ্ঞেস করতে লাগে তো?

মহিমের চোখে যেন আলোর রেখা দেখা দিল, বলল, তা হইলে—

বাধা দিয়ে হরেরাম বলে উঠল, তোমার কানাইদা যে কাজে বার হইছে গো। তারে যে মোরা ন'হাট মহকুমায় পাঠাইছি।

বটে! কুঁজো মালা গেছে কাজে? আর এরাই তাকে পাঠিয়েছে? হায়। মহিমের মনে হল কুঁজো কানাই বুঝি আজও তার কাছে তেমনি দুজ্ঞের্য় রয়ে গেছে। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম কুঁজো কানাইয়ের উপর মহিমের একটু অভিমান হল। কই, তার কানাইদা তো তাকে কিছু বলে যায়নি!

একটি নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবল, যাক। প্রাণটা তবু আশ্বস্ত হল। হরেরাম প্রথমে কাজের কথা শুরু করল। তার আগেই পিছনের দিকে অল্পবয়স্ক কয়েকজন যোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল সে, তোমরা এবার হাসি-কথায় একটু চুপ দেও ভাই। তারপর অখিল চাষীকে বলল, অখিলদা, ধার দেনা কি তোমার কিছু কম আছে যে, মাটিতে দাগ কাটতেছ?

অখিলের এটা অভ্যাস। বসলে নানান রকম দাগ কাটা। সে লজ্জায় হেসে হাত গুটিয়ে নিল। প্রচলিত প্রবাদ, মাটিতে দাগ কাটলে নাকি দেনা হয়।

পেছনের যোয়ানের দল হেসে উঠল। ভজনের পাশে বসে মহিমও মুখ টিপল। দেখল হরেরামের গাম্ভীর্যের আড়ালে ঠোঁটে রয়েছে চোরা হাসি।

ঘরটা মানুষে আর তামাকের ধোঁয়ায় ভরপুর। সকলেই নীরব।

হরেরাম বলল, কুঁজো মালা আজই কি-বা আসবে, না, হাট মহকুমা

অরাজী হইবে না। শোনেন দাদাভাই দর্শজনায়, নিজে না চষে, পরকে দিয়ে চাষ করায় এমন মানুষও যখন এখানে আসছেন, তখন মনে লয় মোদের বেগার বন্ধের লড়ায়ে জয় হইবে।

পেছনের যোয়ানের দল থেকে হঠাৎ একজন উঠে বলল, পাগলা বামুন না আসতেই শুরু করলা যে?

হরেরাম বলল, পাগলা বামুন আসতে পারবে না, খবর দিছে। তবে সে যা যা বলে দিছে সব কথাই আপনারা শোনবেন।

বলে সে আরম্ভ করল, 'জমিদারে ফাঁকি দিচ্ছে এ্যাদ্দিন সরকারের খাজনা। সে ফাঁক ধরা প'ড়ে জমিদার তার দেনা শুধতে চায় মোদের মাথা কেটে। কথা নাই বাত্তা নাই, ছুট্ বলতে খাজনা বেড়ে গেল, কিন্তুক্ মোরা কেন তা দিব? এ বাড়তি খাজনা না দিলে জমিদার হুজ্জোৎ করবে। করুক, মোরা তবু মানব না। তা ছাড়া, জমিদারে আজকাল আমাদের হাত থেকে জমি নিয়ে একুনে হাজার হাজার বিঘা অন্ত লোকের হাতে তুলে দিচ্ছে। চাষ জমির খাজনার বিধেন তার আলাদা। তার ফলে আমরা উচ্ছেদ হইলাম। এই জমিদারে আর মালিকে মিলে যা শুরু করেছে তার এট্টা পিতিবিধেন না করলে মোদের কম্মো সারা।' বলে সে, এমন কি, শত শত বছরের পুরনো প্রথা, ঈশ্বরের বিধানরূপে যা সকলের মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল, সেই শিকড়ে টান পড়তে অনেকে কিছুটা সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু হরেরামের অকাট্য যুক্তি ও উদাহরণ সাপের মত কুটিল এই অবুঝ সংশয়ের মাথা দিল নত করে। এই চাপানো বিধানের প্রতিরোধের নীতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা করে গেল, কথায় কথায় অভিমত চাইল সকলের। সম্মতি পেল, প্রতিজ্ঞা শুনল, পেল আশা ও উৎসাহ। সগৌরবে জানিয়ে দিল, আর নয়নপুরই প্রথম শুরু করবে তিনটি মহকুমার

মধ্যে। এবারকার হেমন্ত নয়নপুরের বুকে নতুন চেহারায় পদক্ষেপ করবে, নতুন তার স্বাদ গন্ধ। শুধু তাই নয়, আগামী বছরে এই সূত্র ধরেই আসবে ভাগচাষীর ভাগের লড়াই সেকথাও ঘোষণা করা হল।

ভজন দেখল, মহিমের চোখ দুটো যেন মোটা সল্‌তের প্রদীপের মত জ্বলছে।

জ্বলবে না! তার মনে পড়ছে একটি উজ্জ্বল মুখ, একটি আবেগদীপ্ত কণ্ঠ। লক্ষ গ্রামের এ অনাগত গৌরবের কাহিনী একদিন সেই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। নয়নপুরের খালের জলে জোয়ার আসার মত প্লাবিত করেছিল তার অন্তর। কিন্তু ভাটা আসতে দেরি হয়নি। আজ আবার জোয়ার এসেছে। কিশোরের সেই কানে শোনা কথা আজ চলেছে কাজে হতে। আর শুনেছিল, শিল্পসাধনা আপসের পথ ধরবে যদি না তুমি এ মানুষের বাঁচার তাগিদে ভাস।

সে কণ্ঠ, সে মুখ পাগলা গৌরাঙ্গের। বুঝল সে মানুষটি তার কাজ করে চলেছে অহর্নিশ। কোন কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। আর এই প্রথম সে অনুভব করল, গাঁয়ের সমস্ত কিছু থেকে সে কতখানি দূরে। মূর্তি গড়ায় কাজের মাঝে সে সবাইকে সবরকমে ভুলে বসে আছে, অথচ তার খবর এরা সবাই রাখে সবটুকু। ভরত হয়তো একথা জানে, কিন্তু তার স্বার্থ থাকলেও দায়ে পড়েই বোধ হয় নীরব। মহিম কাজের ফাঁকে অনেকের সঙ্গে মেশে, কিন্তু গাঁয়ে ঘরে যে দিনে দিনে কত কাণ্ড ঘটছে, সে কথা কেউ তাকে বলেনি, জেনে নেয়নি সেও কারুর কাছ থেকে। মনে হল, সে যেন বহুদিন পরে হঠাৎ দেশে ফিরে এসেছে, এসেছে আপন মানুষদের কাছে। আর এই হরেরামদা। নিজের উপর শুধু ধিক্কার নয়, বুকটা ভরে উঠল মহিমের। নয়নপুরের চাষী-

অনিস্থিরা আজ সকলেই নিধনের জাগ্রত শিব। সমাহত, ক্রুদ্ধ। চোখে চোখে আগুন, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মহিমের বুকে।

ঘরের মধ্যে তখন নানান্ জনে নানান কথা বলছে। মহিম এগিয়ে গেল হরেরামের কাছে। বলল, স্বপন দেখছিলাম 'হরে-রামদা, কথা শুনছি অনেক কিন্তুক্ এ মনটার ছিরিছাঁদ নাই, তাই চোখ পথ দেখতে পায় না সব সময়। মোর কি কোন আলাদা কাজ নাই?

নাই কেন? হরেরাম বলল, ধম্মোঘটের পূজো দেব মোরা, তোমারে তৈরি করতে হইবে সেই ঘট আর ধম্মোদেবের মুত্তি। তোমার মনের মত বানাবে।

কে একজন হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল:

নতুনকল্পের গব্ভে সন্তান
ঢ্যালামাটির মাঠে ধান,
অনাবিষ্টির আকাশে জল;
দিন কখনো সমান যাহে না,
(ও) তোমার গত বিধেন না ভাঙিলে
নতুন বিধেন হবে না
জোড় হাতে বলি একবার কর পিনিধান।

পথ চলতে চলতে মহিমের মনে সেই অতীতের পাগলা গৌরাঙ্গের কথা-গুলো গুন গুন করতে লাগল। সেই কথার পাশাপাশি অহল্যার কথা-গুলোও মনে পড়ল তার। মোর ভাবনার অন্ত নাই তোমারে নিয়া। কেবলি ডর লাগে, মোদের ছেড়ে চলে যাবে তুমি, এ গাঁ ঘরের আপন-জন বুঝি তোমার পর। এ কথার সঙ্গে পাগলা বামুনের ফারাক কোথায়, বিচার-কথা মন মহিমের খুঁজে পায় না তা। অথচ কি ছিষ্টি-

ছাড়া রাগে ও ত্রাসে বউদি বলে তার, পাগলা বামুন তোমারে কেড়ে নিতে চায় পর করবে বলে।

না। অহল্যা বউয়ের একথা ভুল। ভুল মনে হতেই তার প্রাণে নতুন আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধল—তার জীবনের একই নির্ঝর থেকে বয়ে-চলা এই ধারা দুটিকে একত্র করতে হবে।

আকাশে ঘন মেঘের ভিড় দক্ষিণ থেকে পাড়ি জমিয়েছে উত্তরে। আকাশে তাকিয়ে মনে হয়, বুঝি ভূমণ্ডলই চলেছে দক্ষিণ দিকে। হালকা হাওয়ায় শীতের আভাস। দিবাগতিকে আপনা থেকেই মনে হয় গা যেন ম্যাজ্‌ মেজে লাগছে। এ ঘোর কাটলেই বোধ হয় হেমন্তের উজ্জ্বল আকাশ দেখা দেবে।

আখ্‌ড়া থেকে খোল করতাল সহযোগে নসিরামের বৃদ্ধগলার গান শোনা যাচ্ছে: প্রাণ ভরিয়ে প্রাণনাথ তোমায় ডাকি হে, প্রাণে আশা, প্রাণে আমার তোমায় পাব হে। মাঝে মাঝে সেই গলাকে ছাপিয়ে উঠছে প্রাণেশের মোটা গলা, পাব হে, পাব হে। পাব হে কথাটা যেন তার গলায় জেদের মত শোনাচ্ছে।

আগল ঠেলে বনলতা ঢুকল গোবিন্দর বাড়িতে।- ডাকল, পিসি!

সাড়া না পেয়ে গোবিন্দর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। গোবিন্দের দরজা বন্ধ! এত বড় ব্যতিক্রম আর কোনদিন চোখে পড়েনি বনলতার। সামান্য অসুখে বিসুখে তো কখনো সাধুর দরজা বন্ধ দেখা যায়নি। তবে কি কোন ভারী ব্যামো হল তার?

ভাবতেই বনলতার বুকের মধ্যে শংকায় ভরে উঠল। সে দাওয়ায় উঠে ডাকল, সাধু, সাধু ঘরে আছ।

জবাব পেল না। তাকিয়ে দেখল পিসির ঘরের দরজায় শিকল তোলা। গোবিন্দর দরজায় সামান্য ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল।

দেখল, গোবিন্দ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। বাসি বিছানা কেমন যেন বড় বেশি দোমড়ানো এলোমেলো। ঘুম না অচৈতন্য গোবিন্দ? কাছে গিয়ে বনলতা ডাকল, সাধু, সাধু!

গোবিন্দ নিশ্চুপ নিথর।

এবার অসহ্য উৎকণ্ঠায় বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল বনলতার, সে গায়ে হাত দিয়ে ডাকল গোবিন্দকে। সাধু, কি হইছে? বেলা যে পোহর গড়ায়।

একটা বিরক্তির শব্দ করে গোবিন্দ উঠে সরে বসল। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে সাধুর! আচমকা ভয়ে ও বিস্ময়ে বনলতার প্রাণ কেঁপে উঠল। চোখ লাল, গাল বসা। সমস্ত মুখে একটা যন্ত্রণার চাপা আভাস। কেন? জিজ্ঞেস করল সে, কি হইছে তোমার সাধু? অসুখ বিসুখ করল নাকি?

বনলতার আকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত স্তব্ধ রইল গোবিন্দ। এই দুর্জয় বৈরাগীর মেয়েটির চোখে রুদ্ধ দুষ্টামির আভাস পেলে সাধক মন খুলে তবু যা খুশি তাই বলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তেই এই সুরটি তাকে বড় থমকে দেয়। সে অস্বস্তি বোধ করে এই ভেবে যে, এ বুঝি দামাল মেয়েটার নতুন কোন কিছু ঘটানোর ভূমিকা। যত ভাবে মন কষে গোবিন্দ। বলল, কিছু হয় নাই মোর। কিন্তু তুই এই সাত সকালে এখেনে কেন?

মুখের অন্ধকার ঘুচল না বনলতার। বলল, তোমার 'কেন' শুনলে মোর গা জ্বালা করে সাধু। কি হইছে কও। শরীল কি খারাপ করছে?

গোবিন্দ বলল, না।

কিন্তু কি এক গভীর দুশ্চিন্তা যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে গোবিন্দকে।

মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি অন্তরাবদ্ধ হয়ে উঠল, বুঝি ভুলেই গেল বনলতার কথা। তার শান্ত সাধক জীবনের কোথায় যেন একটা অশান্তির দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মনটাকে তার দু-হাতে বেড় দিয়ে রেখেছে যেন এক গভীর সমস্যা—যা নাকি তার দৈনন্দিন জীবনে এনে দিয়েছে ব্যতিক্রম।

এ ব্যতিক্রম ও অশান্তির ধোঁয়া যে বনলতার নিঃশ্বাস আটকায় তা বোধ হয় গোবিন্দ জানে না। বনলতা বলল, কোন কিছুর মধ্যে নাই, তোমার আবার এত ভাবনা কিসের?

অর্থাৎ গোবিন্দ এ সংসারের বাইরে, জীবন তার ভাবনাহীন। খোঁচাটা তার দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মগজে বাজল বড় রূঢ়ভাবে। বুঝল, তার চিন্তার কাজের কোন মূল্য নেই এদের কাছে। বলল, তোর কি কোন কাজ নাই ঘরে আখড়ায়?

চোরা হাসি ফুটল বনলতার ঠোঁটে। ভ্রু তুলে বলল, নাই আবার? কত কাজ। শেষ নাই তার। হাসিটুকু চোখে না পড়লেও মনের হাসির আঁচ পায় গোবিন্দ। বলল, তবে মোর ঘরে কেন তুই?

মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল বনলতা। চেষ্টা করল গম্ভীর গলায় বলতে, তাই তো বলি তোমার ওই কেন শুনলে গা জ্বলে মোর। ঘর আখড়া মোর এইটাই।

স্তম্ভিত হল গোবিন্দ। তার দিকে মুখ ফেরাতেই ত্রাস ফোটে গোবিন্দের চোখে। বনলতার গায়ে জামা নেই, শাড়ীতে ঢাকা। তবু গোবিন্দর মনে হল তার বলিষ্ঠ উদ্ধত যৌবন যেন সবটুকুই উন্মুক্ত, সুস্পষ্ট। যেন তার ভারে আর সমস্ত কিছুকে সে দলে দিয়ে যাবে। চন্দন কাঠের কণ্ঠি তার শ্যামল নিটোল গলার হার মানিয়েছে সোনার হারকে। তার চোখ মুখের এই বিচিত্র নাম-না-জানা হাসি, আর সাংঘাতিক নির্লজ্জ উক্তি, সব মিলিয়ে গোবিন্দর গভীর দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন

মনে নতুন বিপর্যয় সৃষ্টির উপক্রম করল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, কুকথা বলতে কি তোর বাধে না বনলতা?

মোর কথা কুকথা, তোমারই সব সুকথা বুঝিন্?

তোর কথা মেয়েমানুষের মুখে শোভা পায় না।

কেন কও তো? সত্য কথা বলে?

ছিঃ! সত্য নিয়া খেলা করিস না।

সাধু, সে খেলা কর তুমি। মিছের কারবারে সাধ ছিল না কভু, আজও নাই।

গোবিন্দ আজ উত্তেজিত হল আরও বেশি। বনলতার কথা বুঝি এতখানি আর কোনদিন বাজেনি তার। বলল, সত্য নিয়া খেলা করি আমি?

নয়? বনলতার কথার ধার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠস। বলল, মোর কথা মেয়েমানুষের মুখে শোভা পায় না, তুমি মোরে গালি দিলা। তোমার কথা কি পুরুষের মুখে শোভা বাড়াইছে?

বনলতার এ কণ্ঠ ও মূর্তি এতখানি চমকপ্রদ যে, গোবিন্দ তার নিজের উপর মিথ্যা দোষারোপের কথা ভুলে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল।

বনলতা আবার বলল, মোর কথা মেয়েমানুষের নয়, মুই নই মেয়েমানুষ। তবে বলি, তোমার এ ভগমানের পিথিমিতে পুরুষ নাই, নাই, নাই!

সমস্ত ব্যাপারটাই অবুঝ ও অভাবনীয়। তাড়াতাড়ি এটাকে চাপা দেওয়ার জন্ত গোবিন্দ ডাকল, লতা!

হ্যাঁ, ওই মোর নাম। রাতবিরেতে লোকে নাগিনীর নাম করে না, বলে লতা। তুমি মোরে তাই ভাব।

গোবিন্দ অসহায়ের মত বলে উঠল, থাম্ থাম্ বনলতা। কাল পাগলা-বামুন বুকটারে মোর টুণ্ডা করে দিছে। আজ আর মুই সইতে পারছি না কিছু।

বনলতা থামল কিন্তু দারুণ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল তার শরীর, বিশাল তরঙ্গের মত বুক দুলে উঠল। বার বার মরণ কামনা করল সে। এ কান্না আর কামনা বুঝি থামতে নেই কোনদিন। এ পোড়া দেহ ও মনের দৌরাত্ম্য আর সয় না।

পরমুহূর্তেই লজ্জায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল তার। কই, এমন করে তো সাধুকে সে বলেনি কখনও, ভাবেনি কোনদিন! ছি, এ মুখ বুঝি আর দেখান যাবে না সাধুকে। তাড়াতাড়ি কাপড় গুছিয়ে ঘোমটা টেনে বনলতা উঠে দাঁড়াল। বলল অন্যদিকে মুখ করে, মুই অভাগিনী, মোর কথায় কান দিও না। পাগলাবামুন তোমারে দুঃখ দিছে, তোমার যাতনা দেখেই তো চুপ থাকতে পারি নাই। তুমি মোরে খেদাই দিলা।

বলতে বলতে তার গলায় আবার কথা আটকাল। গোবিন্দ স্তব্ধ। একবার প্রতিবাদ করতে চাইল বনলতার কথার। কিন্তু বাধা পেল। উঠোন থেকে নরহরির মিষ্টি আবেগমাখা গলা গুন্‌গুনিয়ে উঠল :

আমি অভাগিনী রাই,
কাঁদিয়া বেড়াই
কানু সঙ্গ আশে।
মুড়িয়ে কুলমান
সে তো পলাইছে
মোর হিদয় ভরিয়া বিষে।

বনলতা বেরিয়ে এল। চোখে তার তখনও জলের দাগ, মনের স্পষ্ট ছাপ মুখে। সেই মুখে ছড়িয়ে পড়ল নরহরির গানের সুর। বৈরাগী যেন তার অন্তর্যামী, কিছুই তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। নরহরির ঠোঁটে বেদনামুগ্ধ হাসি। বলল, তাই ভাবি, সই গেল কুনঠাঁই। চল বাইরে যাই।

বনলতা বাড়ির বাইরে এল। নরহরি বলল, তোমার চোখের জল যে শুকায় না সই। পরানটা খানিক কঠিন কর।

বনলতা বলল, পরান যে মোর বশ নয়।

কিন্তক্ পরান বশ না হইলে আর সব যে বশ হইবে না।

তবে এ ছার পরান শেষ হউক।

ছি, বে-রীতির কথা বল না। পরান যে অনেক বড় বস্তু। চাই বললে আসে না, যাও বললে যায় না। তার একটা ধর্ম আছে তো?

তারপর ক্ষণিক নিশ্চুপ থেকে সে বলল, বাপ বলছিল তোমার, বেটি বড় মুষড়ে থাকে নরহরি, তোমার সঙ্গে যদি ভিক্ষায় বার হয় তো ওরে নিয়ে যেও। যাবে সই?

কি আকুল আগ্রহই না ফুটে উঠল নরহরির জিজ্ঞাসু চোখ দুটোতে! একটি জবাবের জন্য বুঝি তার সর্বাঙ্গই উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

এ হল এই দেশগাঁয়ের রীতি। বোষ্টম বোষ্টমী গান গাইতে আসে। বাড়ির ভাল জায়গাটিতে দুখানা আসন পেতে দেয়। তারা জগৎ ভুলে কৃষ্ণগাথা, বিরহ-মিলনের গানে গানে হাসিতে বেদনায় মানুষের মনকে ক্ষণিকের জন্য আতুর নিষ্কর্ম করে দিয়ে যায়।

আগে যেত বনলতা। আজকাল আর সচরাচর যায় না। নরহরিও ডাকে না বিশেষ।

বনলতা বলল, শরীর অবশ লাগে, তুমি যাও। তা ছাড়া, সাধুর কি যেন হইছে।

নিমিষে নরহরির চোখের সমস্ত আলোটুকু নিভে গিয়ে অন্ধকার চোখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, সে-ই ভাল সই। আমি যাই।

হন্ হন্ করে পথ চলে তেপান্তরের বুকে একবার দাঁড়ায় নরহরি। একতারাটার তারে ঘা দেয় কয়েকবার। তারপর উজোন ফিরে চলে খালের মোহনার দিকে। সারা দিনমান আজ তার সেখানেই কাটবে, গান গাইবে। আর নির্জনে সে গান হবে তার স্বগতোক্তি।

১২

বনলতা চলে যাওয়ার পর ক্ষণিক বিমূঢ় বসে রইল গোবিন্দ। মহিম এল এই সময়। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি দু হাত বাড়িয়ে মহিমকে টেনে নিয়ে বলল, মহী আসছিস! এখুনি ছুটতাম তোর কাছে।

কেন, কি হইল?

মুই কোন কিছুর দিশা পাই না মহী। জগৎ বড় বেতাল লাগে মোর কাছে।

মহিম দেখল গোবিন্দের মুখে একটা দুশ্চিন্তা ও চাপা যন্ত্রণার ছাপ। দিশেহারা চোখ। বলল, রাতে ঘুমাস নাই নাকি?

ঘুম মোরে ত্যাগ দিছে—গোবিন্দ বলল—বুকে মোর পাষাণ। দুঃখ দিয়া কানাই মালারে গাঁ-ছাড়া করলাম।

মহী বলল, সেই নাকি তোর ভাবনা?

বলে সে কুঁজো কানাই ও হরেরামের বাড়ির সমস্ত ঘটনা বলল গোবিন্দকে। আশা করেছিল, গোবিন্দের চোখেও আশা আনন্দ ফুটে উঠবে তার মতো। কিন্তু অন্ধকার ঘুচল না তার মুখ থেকে। বলল, পাগলা বামুন মোর মাথায় বাজ ফেলেছে।

পাগলা বামুন? মহিম জিজ্ঞেস করল, কি হইছে?

গোবিন্দ বলল, মুই গেছলাম পাগলা বামুনের কাছে কুঁজো কানাইয়ের কথা বলতে। ভাবলাম, পাগলাবামুন এত বোঝে, এত কথা বলে। গাঁয়ে ঘরে জ্ঞানী বলে তার কত নাম। সে কি বুঝবে না কুঁজো কানাইয়ের

এ দুঃখের দায় মানুষের নয়, মানুষের হাত নাই এতে। কিন্তু ··· বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোবিন্দ। অসহায়, চিন্তাচ্ছন্ন।

মহিমের শোনবার আকাঙ্ক্ষা অদমনীয় হয়ে উঠল। যেন, এ প্রশ্নের জবাবটা তারই পাওনা। বলল, তারপর?

পাগলা-বামুন দু-হাতে সাপটে ধরে আদর করে বসাল মোরে। বলল, গোবিন্, দুঃখ পাসনি। কুঁজো কানাইয়ের ছিষ্টিকত্তা মানুষ, দায়টাও মান্ষেরই। মুই ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে বললাম, মিছে বল না পাগল ঠাকুর, পাপ হবে। পাগলা বামুন হাসল। মহী, মিথ্যুক আর পাপী কখনও হাসতে পারে না অমন করে। এ আমি হলপ করে বলতে পারি। হেসে বলল, মোরা দৈব দুর্ঘটনা দেখে ভাবি কেমন করে ঘটল। উপায় না দেখে সেই এক নাড়ার মা ভাড়া ভগবানের দোহাই পেড়ে খালাস পাই। কিন্তু তাই কি? না। খুব সম্ভবত জন্মসময়টিতে কানাই কুঁজো হয়েছে, নয় তো মায়ের পেটে থাকতেই। হুতোশে মোর ঘাম ঝরল। বললাম, কেমন করে? ঠাকুর বলল, সে যে অনেক কথা গোবিন্। তারপর খানিক কাদা-মাটির ড্যালা নিয়া আঙুলের ফুঁটো দিয়ে বার করে দিল, সোজা বার করে দিল, সোজা বার হইয়া আসল। আবার গলিয়ে আবার বার করল, দেখলাম বেঁকে গেছে। ঠাকুর বলল, দেখলি গোবিন্দ, এই হইল কাণ্ড। মায়ের পেট থেকে কানাই প্রমাণ দরজা পায়নি। কুঁজো অর্থে, কানাইয়ের পিঠের শিরদাড়া বেঁকে গেছে।

মোর পুরো পেত্যয় হইল, হায়, পাগল বামুন সত্যি পাগল। কিন্তক্ অন্তর্যামীর মত বলল ঠাকুর, ভাবছিস বুঝি পাগলের কথা বলছি? না রে না। এ মোদের জীবনের অভিশাপ, অন্ধকারে মোদের বাস। দেখলাম, ঠাকুরের চোখে আলোয় আলো, যেন কোন্ জগতে চলে গেছে। বলল, কানাইয়ের মা যদি সেই দেশের মেয়ে হত যেখানে সন্তান প্রসবের সমস্ত

বাধা উচ্ছন্নে গেছে, সেখানে কানাইয়ের জীবনে এ অভিশাপ নেমে আসত না। নয়তো বলি, কানাইয়ের বাপের জবর অত্যাচার ছিল নিজের বৌয়ের উপর, গতিক বোঝেনি। কিন্তু দোষ কার? কুঁজো কানাই এ অভিশাপের বোঝা কি একলা বইবে? না, মোদেরও বইতে হইবে, তেমন দেশটি মোদের বানাইতে হইবে? সেই বানানোর তাগিদ চাই, বাধা থাকলে তারে সরাইতে হইবে। গোবিন্, মানুষ হইয়া খামোখা ওই ভগবানের ঘাড়ে সব চাপিয়ে হাঁটু মুড়ে থাকিস্ না। শুনে বুকের মধ্যে মোর ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল। হায়, এ কি মানুষ, ভগবানের সব বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়া প্রাচিত্তি করতে চায়। কিন্তু সে মুখের দিকে তাকিয়ে সাধ্যি কার বলে, তুমি মিছে বলছ। ঠাকুর যে কত কথা বলে গেল, আমি তার সব কথার মানে বোঝলাম না। আর বার বার বলল, দুঃখ পাস্নি, মানুষের কুসংস্কার একটা সোনার শেকল। হোক্ শেকল, সোনার যে! যাদের চোখে সে সোনা চটে গেছে, তাদের ওই শেকলটুকু ছাড়া সবই গেছে। তাই তারা আজ ঘোর বিবাদ লাগাইছে শেকল ভাঙবে বলে।

মুই আর থির থাকতে পারলাম না। বললাম, ঠাকুর, বামুনের ছেলে, ঈশ্বরে পেত্যয় নাই তোমার? আবার হাসল। মোরে উপহাস্ত করে নয়, বড় দুঃখে। বলল, আমি তোর মনের উপর জুলুম করতে চাই না। মোর কথা যদি বলিস্, তবে বলি, যা দেখতে পাই না, ছুঁতে পাই না, যার কোন হদিস্ই পাই না, তার কথা ভাবি না আমি। আমি সবকিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তোর ঈশ্বরের সাধনা, তবু সে কিছু তো? বললাম, নিশ্চয়। বলল, একবার চোখ বুজে বল্, সে কিছুটা কি?

আমি চোখ বুজে দেখলাম, কিছু পেলাম না। আবার বুজলাম, দেখলাম, ছাইভস্মমাখা বাবা শ্মশানে বসে আছে। আবার বুজলাম,

দেখলাম, রাজপুরের আচাযি্য বসে বসে হাসছে। মোর মাথা ঘুরতে লাগল। বসে থাকতে পারলাম না। মোরে ধরে বসাল আবার, তারপর মানুষের জন্মের কথা শুরু করল পাগলঠাকুর। কিন্তুক মোর যেন কি হইল শুনতে শুনতে, দিশা রাখতে পারলাম না। ছুটে বার হইয়া আসলাম।

গোবিন্দ শুরু হল। বলতে বলতে তার সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মহিমেরও প্রাণটা এ ঘরে আছে বলে মনে হল না। চোখ দুটো তারও শূন্যে নিবদ্ধ অথচ অনুসন্ধিৎসু। সে অনুসন্ধান মনে মনে। গোবিন্দ দেখল, মহিমের চোখে আলোর ছড়াছড়ি, কি যেন সে খুঁজছে। কিন্তু তার চোখে জল জমে উঠল বড় বড় ফোঁটায়। মহিমের কাঁধে মাথা পেতে বলল, মহী, এ সব যদি সত্য হয়, তবে মোর বাপ জীবনভোর এ কি করল? সে কি সব মিছে?

মহিম তাড়াতাড়ি দু-হাতে গোবিন্দর মুখ তুলে ধরে বলল, সত্য মিথ্যা তো বিচারের বিষয় গোবিন্ ভাই, তার জন্ত তুই উতলা হইস কেন?

গোবিন্দ বলল, সেই তো হইল গেরো। ছুটে গেলাম রাজপুরে আচাযি্যর কাছে, বললাম সব। তিনি তখন খাওয়ায় ব্যস্ত। বললেন, কাল আইস, জবাব দেব। কিন্তু পাগল ঠাকুরকে কেবলি গালাগাল দিতে লাগল। সে মোর সইল না। বড় খারাপ লাগল আচাযি্যকে। চলে আসলাম।

মহিম বলল, বেশ তো, এর সন্ধান তো মস্ত বড় কাজ গোবিন্ ভাই। সকলের কথা শোন তুই। বলল, কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝল পাগল বামুন কোথায় যেন গোবিনের মনে এক মস্ত ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। অপরের মনে হয়তো লাগল না এত, গোবিন্ বলেই এতখানি লেগেছে। কেন না, তার ধর্মবিশ্বাস তো আর দশজনের মত নয়, সে যে তার জীবনের আর

সব কিছুকে অন্ধকারে রেখে দিয়ে একটা শক্ত বেড়ার মধ্যে আটকে রেখে দিয়েছে।

গোবিন্দ চোখের জল মুছে বলল, মহী, বাবার সব যদি মিছে, তবে মোর মায়ের দুঃখ বুঝি বুকের রক্ত দিয়েও শোধ করা যাবে না। মাকে মোরা সবাই মিলে মেরে ফেলছি।

উঠোন থেকে পিসির গলা শোনা গেল। গোবিন্ আছিস্ রে, গোবিন্! পর মুহূর্তেই গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। তুই ওখানে কি করছিস লা?

মুহূর্ত নীরব।

গোবিন্দ মহিম বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বনলতা, খানিকটা অপ্রতিভ ভাবে। চকিতে সেটুকু কাটিয়ে সে বলল, মহীরে ডাকতে আসছি।

সেই মুহূর্তেই সকলের চোখ পড়ল, পিসির সঙ্গে একটি ফুটফুটে শাড়িপরা ছোট্ট মেয়েকে। নাকে নোলক, পায়ে মল। বিস্ময়াম্বিত দুটো বড় বড় চোখ। যেন জন্মে অবধি বিশ্ব দেখা হয়নি তার। আর এক মাথা ঝাঁপানো কালো চুল।

মহিম জিজ্ঞেস করল, পিসি ও কে?

পিসি সে কথার জবাব না দিয়ে বলল ভারী তুষ্ট হয়ে, মাকে মোর এ উঠোনটিতে কেমন মানিয়েছে দেখ দিকিনি, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পরমুহূর্তেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছলছল চোখে বলল, পরের মেয়ে দু-দিনের জন্য নিয়ে আসলাম বেড়াতে। চেরদিনের জন্য ঘরে তোলা যাবে কি?

মহিম তাকাল বনলতার দিকে, বনলতা তাকাল গোবিন্দের দিকে। গোবিন্দর চোখ আর মন তখন এখানে নেই, এ জগতেই কি-না সন্দেহ।

বনলতার নিশ্বাস পড়ল একটা। তা স্বস্তির না দুখের সে-ই জানে।

সবাইকে এ রকম নির্বাক দেখে পিসি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে মেয়েটির হাতে টান দিয়ে বলল, আয় তো মা, মোর ঘরে উঠে আয় তুই।

পিসীর নবীনা কিশোরীর চোখে চাপা সংশয় ও অস্বস্তি দেখা গেল। গোবিন্দর দাওয়ায় মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন বলল, মোর পানে তাকিয়ে! কিন্তুক্ হাসো না কেন তোমরা?

১৩

ভর দুপুরবেলা পরান এল মহিমকে ডাকতে।

অহল্যা খাওয়ার শেষে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে ডোবার দিকে যাচ্ছিল। পরানকে দেখে ঘোমটাটা একটু বাঁ হাতে টেনে দিয়ে বলল, পরানদা যে!

পরাণ বলল; হঁ্যা, আসলাম তোমার দেওররে ডাকতে। মহী কুনঠাই?

ঘরে আছে। কে ডাকল, কত্তা নাকি?

না। ছেলের বউ।

অহল্যা পরানের দিকে তাকাল। পরানও তাকিয়ে হেসে বলল, তোমাদের মত তো নয়, শহুরে বউ। বাপ তার একেবারে সায়েব। দেখ নাই কভূ ছেলের বউকে?

অহল্যা বলল, দেখছি। তা, বউ ডাকল যে?

সে কথা মুই জানব কি করে বল? হয় তো ফরমাস আছে কিছু। বলেই পরানের মুখে এক গাল হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমার দেওর ছাওয়ালটি বড় সোজা নয় বউ। দেখলাম তো সেদিন তারে টলানো বড় কঠিন। ফরমাস মত কাজ সে করবে না।

অহল্যা নীরব রইল।

মহিম বেরিয়ে এল কাদামাটি হাতে। কি খবর পরানদা?

একবার যেতে হবে ভাই, বউমা ডাকছে তোমারে।

অহল্যা তাকিয়েছিল মহিমের মুখের দিকে। মহিম ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, চল যাই। তারপর অহল্যাকে বলল, তা হইলে একবার ঘুরে আসি বউদি।

অহল্যা বলল, যাও। দেখো আবার খুঁজতে পাঠাতে না হয়। এবং তার চোরা হাসিটুকু মহিমের চোখ এড়াল না।

মহিম সেদিনের অন্ধকারের যমদূতের মত ইমারতের মধ্যে আজ দিনের বেলা ঢুকল পরানের সঙ্গে। সেদিন মনে করছিল রাত্রের রূপের সঙ্গে দিনের তফাৎ থাকবে। কিন্তু না। কেমন যেন একটা তমসাচ্ছন্ন-ভাব নিয়তই এখানে বিরাজ করছে। নিস্তব্ধ, খা খা। প্রথম মহলের সব দরজাগুলোই বন্ধ। দ্বিতীয় মহলের অবস্থাও তাই। তবে সব বন্ধ নয়।

পরান হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, দাঁড়াও একটু, আসছি।

এ মহলের চত্বরে হাওয়া বয়ে যায় না। ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে যায় আবার। আর এক বিচিত্র শব্দ তুলে দিয়ে যায়। সে হাওয়া দেয়ালে খিলানে থামে আঘাত লেগে দীর্ঘনিশ্বাসের মত হাহাকার শব্দ তোলে।

মহিমের মনে হল, এতবড় প্রাসাদ, কিন্তু কি সাংঘাতিক নীরব। আর যেন প্রতিটি বন্ধ দরজায় জানালার আড়ালে আড়ালে জোড়া জোড়া চোখ উঠোনের মাঝখানে তাকে উগ্র চোরা দৃষ্টিতে দেখছে। সে তাড়াতাড়ি খোলা আকাশের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে দেখল, সেই একেবারে উঁচু আল্‌সে থেকে এক রাশ দীর্ঘ চুল এলিয়ে ঝুলে রয়েছে।

কে ওখানে, কার ওই চুল? মহিম চোখ নামাতে পারল না,

তাকিয়ে থাকতেও তার বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে এল। এখুনি কি চলে যাওয়া যায় না এখান থেকে। পরানদা আসে না কেন? হঠাৎ চুল নড়ে উঠল আর আলসের মাথায় একখানি মুখ উঁকি মারল। সে মুখের বিশাল দুই চোখের খরদৃষ্টি তারই দিকে। পরমুহূর্তেই সেদিনের মত নারীকণ্ঠের খিল খিল চাপা হাসি শুনে তার কানের পাশ দিয়ে শিরদাড়া পর্যন্ত কি একটা সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেল।

পরান এসে ডাকল, কই, আস। কিন্তু মহিমকে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরান হঠাৎ বজ্র ফাটানো গলায় একটা চীৎকার করে উঠতেই হাসি থেমে গেল, সেই মুখ ও চুলও হল অদৃশ্য।

মহিম এসে জিজ্ঞাসু চোখে পরানের দিকে তাকাল। পরান শান্ত গলায় বলল, পাগল একটা! আস, বউমা বসে আছে।' বলে তার মুখের ভাবটা এমনই হয়ে উঠল যে, মহিমের মনে হল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এখানে নিরর্থক।

সেদিন হেমবাবু যে ঘরে বসেছিলেন, সেই ঘরের ভিতর দিয়েই পরান মহিমকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল। মহিম আশ্চর্য হল, ঘরে এত আলোর ছড়াছড়ি দেখে। অথচ বাইরে থেকে মনে হয় এ প্রাসাদের ঘর বুঝি সব অন্ধকার।

উমার ঘরে মহিমকে পৌছে দিয়ে পরান অদৃশ্য হল। একটা অদ্ভুত সুগন্ধ মহিমের নাসারন্ধ্র আচ্ছন্ন করে দিল। এ ঘরটির আসবাবপত্র সব কিছুই হেমবাবুর ঘরের সঙ্গে মূলত তফাৎ। দুটি মস্ত বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দিগন্তবিসারী মাঠ, খাল, ওপার, রাজপুরের সুস্পষ্ট রেখা। আর জানালা যে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়, তা বুঝি আগে কখনও জানত না মহিম।

'মস্তবড় খাটের শিয়রের দিকের রেলিং-এ কারুকার্যখচিত কাঠের

ফ্রেমে যুগল দম্পত্তির ফটো। একজন উমা, পুরুষটি হেমবাবুর ছেলে হিরণ। আরও নানান্ রকম মস্ত বড় বড় ছবি দেয়ালে রয়েছে। কেউ ঘোরায় চড়ে, কেউ রাইফেল হাতে, মাথায় পাগড়ি, বিচিত্র টুপি, নানান্ রকম। তারমধ্যে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার চিত্রটিই মহিমের চোখে একমাত্র পরিচিত মনে হল।

উমা এমনটিই আশা করেছিল মহিমের কাছ থেকে, এই বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু শিল্পী তো তার দিকে একবারও তাকাল না। এ রুচিবোধের যে অধিকারিণী, ওই দৃষ্টি কি তারও প্রাপ্য নয়। ভাবল, এ হল নয়নপুরের চাষীর ছেলের সঙ্কোচ। কিন্তু সে একবারও এই শিশুর শিল্পীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারল না। শিশু, একেবারেই শিশু। ওর চোখেও শিশুরই অতল রহস্য. গভীর দৃষ্টি। ঘাড় অবধি বেয়ে পড়া কোঁচকানো চুলের এখানে ওখানে কাদামাটির দাগ। পরনে একখানি ফতুয়া, মাটির দাগে ভরা ছোট ধুতি। শ্যামল নরম মিষ্টি শিল্পী। এক বিচিত্র রঙের আঁচ লাগিয়ে দিয়েছে শহুরে অভিজাত ঘরের বিদুষী উমার মনে। তবু ওর ঋজু শিরদাড়াটা চোখে যেন বড় লাগে! খাড়া, কঠিন, যেন নমনীয় হতে সে জানে না।

উমা বলল, বস!

সম্বোধন শুনে চমকে ফিরল মহিম। সেই বঙ্কিম ঠোঁট, তবু মমতার আভাস, আবেগদীপ্ত চোখ, অনাড়ম্বর বেশ।

উমাও বুঝল, সম্বোধনে চমক লেগেছে মহিমের। হেসে বলল, 'তোমাকে 'তুমি' বললাম জমিদারের ছেলের বউ বলে নয়। এত ছেলেমানুষ মনে হয়, কিছুতেই আপনি বলতে ইচ্ছে করে না।'

উমার চোখ দেখে সে কথা বিশ্বাস করল মহিম। সে প্রণাম করতে গেল উমাকে। কিন্তু আজ আবার উমা দু হাতে তার হাত ধরে

ফেললে। বলল, ছি, বারে বারে পায়ে হাত দিও না। আমি তো তা বলে তোমার বড় নয়।

মহিমের বিস্ময় বেড়েই উঠল। অথচ সেদিন বিদায়ের সময়ে নিঃসঙ্কোচে উমা প্রণাম গ্রহণ করেছিল। সেটা ভেবেই উমা বলল, সেদিন তুমি দুঃখ পাবে ভেবে আর বাধা দিইনি। বস।

কিন্তু সে বলতে পারল না, সেদিন তার মনে এক বিচিত্র আকাঙ্খা ও কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠেছিল শিল্পীর হাতের স্পর্শ তার পায়ে লাগার জন্য।

এ ঘরে খদ্দরের কোন চিহ্ন নেই। মহিম বসল একটি সোফায় সঙ্কোচে আর অত্যন্ত লজ্জায়। উমা তার খুব কাছেই একটি সোফায় বসে বলল, তোমার কথা সব আমি আমাদের কলকাতার বাড়ীতে লিখে দিয়েছি। তোমার কলকাতার কাজের কিছু চিহ্ন আমাদের বাড়ীতেও আছে। আমার ভাইবোনেরা তো সবাই তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

মহিমের চোখে বিস্মিত আনন্দ লক্ষ্য করে উমার চোখেও খুশি ঝলকে উঠল। অভিমানের সুরে বলল, আমার শ্বশুর পুজোয় যেতে দিলেন না আমাকে। নইলে আমরা সকলে বিদেশে বেড়াতে যেতাম। তবে পুজোর পর নিশ্চয় যাব। তোমাকে নিয়ে গেলে ওরা ভারী খুশি হবে। বিশেষ, শান্তিনিকেতনে আমার যে বোন থাকে, সে তো লাফাবে। হঠাৎ একটু থেমে মুখ টিপে হাসল উমা। তার সপ্রতিভ মুখে একটা লজ্জার আভাস দেখা দিল। বলল, আমার সে বোনটি বড় ফাজিল। চিঠিতে লিখেছে, তোমার ওই নয়নপুরের শিল্পী আবিষ্কার তোমার জীবনে এক মহান কীর্তি। কামনা করি, শিল্পী যেন তার এ একান্ত ভক্তিমতীর প্রাণে আরও সাড়া জাগায়। তবে একলা নয়, ভাগ দিও।

না শোনালেও হয় তো চলত, কিন্তু একথাটুকু শোনানর লোভ উমা কিছুতেই সম্বরণ করতে পারল না।

গুণমূল্য নিঃসন্দেহে কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় আনন্দে ও কৌতূহলে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সে। কথা বলতে পারল না। ভক্তিমতী কথাটি তার প্রাণে এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করল আর কলকাতার এক আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে তার সম্পর্কে আলোচনা ও পত্র-বিনিময় গৌরবের নয় কি ? তবু আরও কিছু ছিল উমার বোনের পত্রলেখায়, যে কথা উমা মুখে স্পষ্ট বললেও এক অচেনা প্রতিক্রিয়া হল মহিমের মনে।

উমা তার লজ্জার ভাবটুকু কাটিয়ে খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গে বলল, সত্যি, সকলে কি মনে করে জানিনে, কিন্তু এতখানি প্রতিভা নিয়ে তুমি নয়নপুরে পড়ে থাকবে, এ ভাবতে আমি কিছুতেই পারিনে। তুমিই বল, এতবড় দেশে সকলে তোমার কাজের পরিচয় পাবে এ কি তোমার কামনা নয় ?

অন্যদিকে তাকিয়েছিল মহিম। বলল, এমন করে তো ভাবি নাই কোনদিন।

কিন্তু কেন ভাব না ? কেমন যেন উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিল উমার মধ্যে। বলল, শুনেছি এ দেশে শিল্পীর দুঃখের শেষ নেই, তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ বন্ধ। এ আমি বিশ্বাস করিনে। প্রতিভাবান যে, তার মূল্য মানুষকে দিতেই হবে, কিন্তু শিল্পী নিজে যদি তার পথ করে না নেয় বা চেষ্টা না করে তাহলে কেমন করে তা বিকাশ পাবে। তোমার স্থান হল কলকাতা, তুমি পড়ে রইলে নয়নপুরে, তবে কেমন করে তুমি দশজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। আমার কথাগুলো হয় তো তোমার ভাল লাগছে না কিন্তু তুমি দেখ, যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সকলেই আজ রাজধানীর বুকে জমিয়ে বসে আছেন।

একেবারে অস্বীকার করার মত কথা নয় অথচ কি জবাব দিতে হবে একথার খুঁজে না পেয়ে অসহায়ের মত উমার দিকে তাকাল মহিম। একটু পরে বলল, মোরে কি করতে হইবে, বলেন?

উমা তার আরও কাছে সরে এল। নিজের এই আবেগকে সে নিজেই বোধ হয় চেনে না। বলল, তুমি নয়নপুর ছেড়ে চল, চল কলকাতায়।

উমার নিজের কানেই কথাগুলো ভীষণ ঠেকল। কিন্তু নিজেকে সে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারল না, চোখ ফেরাতে পারল না মহিমের উপর থেকে।

কিন্তু মহিমের বুকে যেন বাজ পড়ল। 'নয়নপুর ছেড়ে চল'—একথার চেয়ে নির্দয় বুঝি আর কিছু নেই। সে আবার অসহায়ের মত তাকাল উমার দিকে। সেই আবেগদীপ্ত চোখ, সেই বঙ্কিম ঠোঁটে মমতার আভাস শুধু আর নয়, আরও যেন কি রয়েছে। তার শরীর ঝুঁকে পড়েছে। আঁচল খসা, প্রশস্ত কাঁধ ও বুকের অনেকখানি জায়গা খোলা জামা। সুগঠিত বুকের মাঝখানে এক অন্ধ রহস্য উঁকি মারছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ বুঝি শোনা যায়। স্পন্দিত সোনার হার।

নয়নপুরের খাল থেকে মাঠের উপর দিয়ে হু হু করে দমকা হাওয়া ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। এলোমেলো করে দিল সব যেন মনটার মধ্যে।

মহিম মুখ ফিরিয়ে সমস্ত ঘরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, মোরে খানিক ভাবতে দেন।

প্রশান্ত হ'য়ে উঠল উমার মুখ। ঠিক হয়ে বসে বলল, রবীন্দ্রনাথের একখানি মূর্তি তোমাকে আমি গড়তে বলেছি। শান্তিনিকেতনে গেলে তাঁকে দেখতে পাবে। তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাদের ঘরে এমন একটি ছেলে থাকলে তাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতাম।

মহিম বলল, আমি তা হইলে যাই?

উমা সে কথার জবাব না দিয়ে বোধ হয় তার আবেগকে সংশোধন করার জন্য বলল, আমার কথাগুলো তোমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগল, না? আমার শ্বশুরকে ধন্যবাদ, তিনি তোমাকে ডেকে এনেছিলেন।

এতক্ষণে মহিম জিজ্ঞেস করল, কর্তা কই?

তিনি গেছেন কয়েকদিনের জন্য এক দূরের তালুকে। তিনি তোমাকে এখানে এনে রাখতে চান।

মহিম জিজ্ঞেস করল, কেন?

জবাবে উমা বলল, শুনেছি, এ বাড়ীতে আগের কালে একজন সাহেব ছবি আঁকিয়ে ছিলেন মাইনে করা। এ ঘরের সব ছবি তাঁরই আঁকা। তেমনি এই এস্টেটে তোমাকে আমার শ্বশুর এনে রাখতে চান। আসবে তুমি?

মহিম জানে, রাজা-মহারাজার বাড়ীতে এমনি মাইনে করা অনেক বড় বড় শিল্পী থাকেন। বলল, 'তা তো জানি না। আমার দাদা বউদি রইছেন, অর্জ্জুন পাল মশাই আছেন, আমার গুরুমশাই, তাঁরাই বলতে পারেন।

যদি আস—বলে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে মহিমের দিকে তাকিয়ে রইল। এতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কিছুই বোঝা গেল না।

মহিম উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে কিছুতেই উমার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। তার প্রাণে হাওয়া লেগেছে। বুঝি নয়নপুরের তেপান্তরের দমকা হাওয়ার মত।

উমা জিজ্ঞেস করল, গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

উনি তো মোর সঙ্গে দেখা করেন না। মোরে বুঝি ভালবাসেন না আর।

একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল উমা, সেজন্ত তোমার দুঃখের কিছু নেই। আমরা কি ভালবাসি না?

বাসে। কিন্তু সে ভালবাসা মহিমের কাছে অপরিচিত। সে নীরব রইল।

উমা বলল, তুমি এখন কি কাজ করছ? দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়। সেই দক্ষনিধনের ক্ষিপ্ত শিব নাকি?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মহিম বলল, হ্যাঁ। কিন্তু সে এখন থেকেই যে ধর্মদেবের ঘট তৈরি করছে সে কথা বলতে বাধল। সে আবার প্রণামের জন্ত ঝুঁকে পড়তেই উমা তার দু-হাত ধ'রে ফেলল।—এ কি, বারণ করলাম না পায়ে হাত দিতে। তাহলে তো দেখ্‌ছি 'আপনি' করে বলতে হবে।

বলে সে হাত ছেড়ে না দিয়ে যেন সত্যই ভক্তিমতীর মত ঈশ্বর-অবলোকন করছে এমনিভাবে তাকিয়ে রইল।

আর উমার সর্বাঙ্গ থেকে বিচিত্র সুগন্ধ তার অনুভূতিতে এক অন্ধ আবেগের উন্মাদনা এনে দিল, তার হাত কাঁপল উমার হাতের মধ্যে। এত কাছাকাছি উমার দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখের পাতা যেন অসম্ভব ভর হয়ে এল।

উমার চোখ উজ্জ্বল, নির্নিমেষ, দুর্বোধ্য হাসি। বলল, তুমি আমাকে হাত তুলে নমস্কার কর, আমিও তাই করব। তাকলে এসো কিন্তু।

হাত ছেড়ে দিল সে।

মহিম দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, একটা কথা মোরে বলেন।

উমা কাছে এল। মহিম জিজ্ঞেস করল, মুই একটা হাসি শুনছি এ বাড়ীতে, মেয়েমানুষের হাসি। উনি কে?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে চমকে উঠল উমা,—তুমি হাসি শুনেছ?

হ্যাঁ। শুনারে দেখেছি আমি।

কোথায়?

এ মহলের একেবারে উঁচা আল্‌সের ধারে।

মুহূর্ত নীরব থেকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল উমা, এ কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর' না। আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, যদি তোমায় কখনো কলকাতায় পাই সেদিন বলব।

উমার চোখের মিনতি প্রায় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মহিমকে যে, মহিলাটি নয়নপুরের জমিদারের বিদুষী পুত্রবধূ।

সে বেরিয়ে গেল, গেল মনের মধ্যে এক নতুন প্রতিক্রিয়ার ঝড় নিয়ে। প্রথম দিনের চেয়ে আজ তা আরও বিচিত্র। উমার নতুন ভাব এবং এ বাড়ীর সমস্ত কিছুই।

পরান সঙ্গে ছিল না। মহিম প্রথম মহল পেরিয়ে কাছারিবাড়ীর ভিতর দিয়ে আসবার সময় কে একজন হেঁকে বলল, কে যায়?

মহিম বলল, আমি মহিম।

আমলা দীনেশ সান্ন্যাল বেরিয়ে এসে বলল, দাশু মোড়লের শেষপক্ষের ছেলে না তুই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এদিকে থেকে কোথায়?

মহিম জবাব দেওয়ার আগেই পেছন থেকে পরান বলে উঠল, বউমার কাছে আসছিল।

অ! একটা অর্থজ্ঞাপক শব্দ করে চশমাটা তুলে দিয়ে দীনেশ সান্ন্যাল বলল, কোন পুতুল টুতুলের ফরমাস ছিল বুঝি?

মহিম পরানের দিকে ফিরে তাকাল। পরান বলল, সে খোঁজে কি দরকার তোমার, স্যানেলবাবু। ওরে যেতে দাও।

বোঝা গেল, আমলা কর্মচারীদের কাছে পরানের মান অনেকখানি। দীনেশ সান্ন্যাল বলল, তোমার যেমন কথা পরান, আমি কি আটকেছি না কি। দেখে নিলাম, দাশুমোড়লের ছেলের কপালটা সত্যিই বড় চকচক করছে। হুঁ!

কথাটার মধ্যে কি যেন ছিল। মহিম মুখ ফিরিয়ে এগুল। যেতে

যেতে শুনতে পেল, চাষার বেটা নাকি আবার আর্টিস্ট হয়েছে। আটি বাঁধা ছেড়ে এবার আমের আটির ভেঁপু ফুঁকে বেড়াচ্ছে।

কানের মধ্যে পেরেক ফুটিয়ে দেওয়ার মত কথাগুলো বিঁধল মহিমের কানে। তাড়াতাড়ি এ বাড়ীর সীমানা পেরুতে পারলে যেন সে বাঁচে। এখানকার সবই অপমানকর ভীতিপ্রদ এবং অস্বাভাবিক যেন।

কাছারিবাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণে অর্জুন পালকে হুঁকা টানতে দেখে মহিম তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিল। মহিমের গুরু অর্জুন পাল। অর্জুন পাল বুড়ো হয়েছে এখন। লোক দিয়ে কাজ করায় কিন্তু নিজেও হাজির থাকে সব জায়গায়। চোখে মোটা পাথরের চশমা সুতো দিয়ে বাঁধা। মহিমের চিবুকে হাত বুলিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল, মহী, নাকি গো? ভাল আছ তো বাবা? বস।

মহিম বলল, ভাল থাকবার কি যো আছে পালকাকা।

তা বটে। মহিমের গায়ে হাত দিয়ে বলল অর্জুন, গাঁয়ে ঘরে তোমার বড় নাম হইছে। শোনলাম, বাবুরা তোমারে দিয়া কাজ করাতে চায়। তুমি নাকি গররাজী?'

পালকাকা গুরুর ভাত মারা বিদ্যা মোর জানা নাই। গুরুর দরকার পড়লে ছুটে আসব, সেখানে রাজা-মহারাজার কথা মোর কাছে তুচ্ছ।

সে কি কথা বাবা, সে কি কথা। বলল বটে তাড়াতাড়ি অর্জুন পাল কিন্তু বোঝা গেল, বুকটা তার ভরে উঠেছে খুশিতে। তারপর খানিকটা আত্মগতভাবে ফোগলা দাঁতে হেসে বলল, সকলে বলে, বড় জবর শিষ্য হইছে তোমার পাল। সবদিকে দুরন্ত। মুই বলি, ওটা ভগমানের ছিষ্টি, মহীরে মুই কোন দিন হাতে ধরে শিখাই নাই কিছু।

মহী বলল, তা বললে মুই শোনব না পালকাকা। আপনার কাজ, ধৈর্য দেখেই মুই শিখছি।

অর্জুন পাল হা হা করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, পেথম পেথম মোরে কতজনায় কত কি বলছে। পাগল বামুন যখন তোমায় কলকাতা নিয়ে গেল, পরানটা মোর হুতোশে ঠেসে রইল। লোকে বলল, ওই পালপাড়াই ছোঁড়ার মাথাটা খাইছে। আর তুমি যেদিন ফিরা আসলা—

মহিম বলল, আপনি মোরে বুকে তুলে নিলেন।

পাল আবার হেসে উঠল। বলল, কিন্তু বাবা, বারবার বলছি, আবার বলি অহঙ্কার করিস্ না কখনো। বাবুরা তোরে ডাকছে, শুনে মোর বুক দশ হাত। মোদের কাজ আলাদা, তুই রাজা-মহারাজার ঘরে তাদের শখের কাজ করবি, রাজবাড়ী সাজাবি। তোর মান আলাদা।

দু'জন কারিগর প্রতিমা গড়ছিল। একজন বলে উঠল মহিমকে লক্ষ্য করে, কুমোর হইলেও তোমার কাজ বিশ্বকর্মার।

আর একজন হেসে হুঁকো দেখিয়ে ইসারায় ডাকল মহিমকে। মহিম মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। তারপর প্রণাম করল আবার পালকে। আমি যাই তা হইলে পালকাকা?

পাল যেন কি ভাবছিল। বলল, হ্যাঁ, আস গিয়া। একটু তামাক খাবে না?

এ হল এক মস্ত সম্মান। যুবক পড়শী হোক আর শিষ্য হোক, বুড়োমানুষের এ আমন্ত্রণ বড় কম নয়। বলল, ওটা আর ধরি নাই।

বেশ করছ বাবা, বেশ করছ। এসব যত না ধরা যায় ততই ভাল। মোদের বাড়ী এসো না কেন একবার?

যাব।

আমলা দীনেশ সান্তালের কথার পর পালের সাক্ষাৎ যেন সন্ত ঘায়ে মলমের প্রলেপের মত শান্তি পেল সে।

বেলা গড়িয়ে গেছে একেবারে। সন্ধ্যা নামে।

সাঁকো-পথে না গেলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয় জমিদারবাড়ী থেকে মহিমদের পাড়ায়। বাড়ী আসতে একটু দেরিই হল তার। বাড়ীর মুখেই ভরতের সঙ্গে দেখা হল মহিমের।

ভরত বলে উঠল, এ্যাই যে, বাবু আসছেন। যাও, ওদিকে আবার ভাবনায় হাঁড়ি ফাটছে।

অর্থাৎ অহল্যার দুশ্চিন্তা। হঠাৎ কেমন রাগে মহিমের ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল। বলল, মুই কি ছেলেপান যে ভাবনায় তোমাদের হাঁড়ি ফাটে কেবলি ?

ভাবনা যে ভরতেরও একেবারে না ছিল তা তো নয়। তবু সে নিজের কথা না বলে বলল, যার ফাটছে তারে গিয়া বল্, মোরে নয়। থেমে বলল, তা তুই চটিস কেন ?

সত্যই, চটবার কি আছে। তবু মহিম বলল, চটব না। বাড়ী থেকে পা বাড়ালেই তোমাদের ভাবনা, আর মোর ভাল লাগে না বাপু।

কি তোর ভাল লাগে তবে শুনি ? ভরত বলল, কিছু মোটা টাকার ফরমাশ পেলি নাকি জমিদারের ছেলের বউয়ের কাছ থেকে, অত মেজাজ দেখাচ্ছিস্ ?

থমকে গেল মহিম। এ-কথার থেকে যে ভরত একেবারে এ-কথায় আসবে সে তা ভাবতেই পারেনি। বলল, তা হইলেই তুমি তুষ্ট হও, না ? টাকা ছাড়া কিছু কি চিন না ?

ভরত অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠল। বলল, চিনি কি না চিনি, সে কথা তোরে বলতে চাই না। চাষার ছেলে পুতুল গড়িস্। অকম্মার ধাড়ি, এ-কথা বলতে তোর লজ্জা করে না?

জীবনে যা কোনদিন বলেনি, আজ হঠাৎ এ অবুঝ রাগে মহিম তীব্র গলায় বলে উঠল, গরীবের ছটাক-কাচ্চা জমির পানে শনির মত নজর দিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সেই মোর ভাল।

ভরত দারুণ রোষে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিল মহিমের গালে। হারামজাদা, মোরে তুই শনি বলিস? জমিদারবাড়ীর ছোঁয়া নিয়া আসছ তুমি মোর কাছে তেল দেখাতে?

অহল্যা ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠায় ত্রাসে কাঁপছে সে। ভরতকে বলল, ছি ছি, এ কি করলা তুমি, ঠাকুরপো'রে মারলা?

চুপ কর্ তুই! ধম্‌কে উঠল ভরত। তুই মাগী লাই দিয়ে ছোঁড়ার মাথা খেয়েছিস্। ফের দেওর-সোহাগ দেখাতে এলে তোরে টুণ্ডা করব আমি।'

তারপর বাড়ীর ভিতর গিয়ে নিজের মনেই সে বলতে লাগল, হা রে জ্যালা তোর! ভাল কথা বললাম তো উনি চোট দেখাতে আসলেন। তোর চোটের কি ধারধারি রে আমি। আমি কি কারুর পিত্যেশ করি। সোজা কথা জেনে রাখছি, মোর কেউ নাই। কেউ না।

স্তব্ধ নির্বাক একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে মহিমকে ঘরে যেতে দেখে অহল্যা দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মুখে গেল রান্নাঘরে।

মহিম টলতে টলতে নিজের ঘরে উঠে এল। গালের জ্বালার চেয়েও বুকের মধ্যে একটা দারুণ বেদনায় মুচড়ে উঠল তার। কি যেন একটা ঠেলে আসতে চাইছে গলার কাছে। দক্ষনিধনের শিবের

পায়ে দু-হাত রেখে সে বার বার মনে মনে বলতে লাগল, আমি ছেড়ে দেব একাজ, ছেড়ে দেব। পুতুল আমি গড়ব না আর। এ মোর কাজ নয়। মাঠ মোর জায়গা। আমি আর তোমাদের গড়ব না।...

চোখের কোল ছাপিয়ে জল এল তার। শিবের গা বেয়ে পড়ল সেই জল।

খাওয়ার আগে সারা ক্ষণটি ভরত বক্‌বক্‌ করল। কখনো দুঃখে কখনো রাগে। খেতে বসে খেতে পারল না সে। মনটায় শুধু অশান্তি নয়, মহিমের মুখটা বারবারই মনে পড়তে লাগল তার। ছোঁড়ার যেন কি হয়েছে। কই, এমন করে তো আগে কখনো বলেনি সে ভরতকে। হয় তো জমিদারবাড়ী থেকে দুঃখ পেয়ে ফিরে এসেছে কোন কারণে। শত্রুপুরী যে! আর ভাই কি না। তার বলে ভাবনা ক'রো না তোমরা।...

কিন্তু মহিমকে ডাকতে যেতে পারল না সে। বলল অহল্যাকে, ছোঁড়ারে ডেকে এনে খাওয়াও। বলে সে শুতে চলে গেল।

অহল্যা এসে দেখল মহিম বেড়ায় হেলান দিয়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। ডাকল, ঠাকুরপো। মহিম মুখ তুলল। চোখ লাল, কান্নার আভাস তাতে। কেঁদেছে বুঝি। অহল্যার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সমস্ত ঘটনাটার জন্ম নিজেকেই দায়ি মনে হল তার। কেন সে ভরতকে জানাতে গিয়েছিল মহিমের জমিদারবাড়ীতে যাওয়ার কথা, কেন-বা দুর্ভাবনায় খোঁজ করতে বলেছিল স্বামীকে। কিন্তু, মহিমেরই বা কি হয়েছে আজ। ভাবনায় হাঁড়ি ফাটে কি আর কিছু ফাটে সে কথা জানে অহল্যাই। তা বলে অহল্যার দুর্ভাবনায় মহিমের অন্ত রাগ বিরাগের কথা তো সে জানত না। আর সেই কথাই অহল্যার

মনে দম-ফোলানো ফানুসের মত কান্নায় আর অভিমানে বিরাট হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে নতুন এক রুদ্ধশ্বাস দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে তাকে, না জানি মহিম এর পর কি করবে। যদি ছেড়ে যেতে চায়!

সে ডাকল, ঠাকুর পো, খাবে চল।

নির্বিকারভাবে বাধ্য ছেলের মত তাকে উঠতে দেখে অহল্যার দুশ্চিন্তা গভীর হয়ে উঠল। এত নিবিরোধী মহিম, এ ঘটনার পর এক কথায় খেতে উঠল!

খেতে বসে কয়েক গ্রাস খেয়েই মহিম উঠে পড়ল। অহল্যাও উঠল।

মহিম বলল, খাবে না তুমি?

মোর জন্ম ভেব না। কিন্তুক্, এই কি তোমার খাওয়া?

দিন তো সব সমান নয়, অনিচ্ছাও তো হয় মানুষের। তুমি উপোস থাকবে ভেবেই বসছিলাম।

মোর উপোসের জন্ম? হাহাকার করে উঠল অহল্যার বুকের মধ্যে। কান্না চেপে বলল সে, তাই যদি, তবে চল দুটো কথা বলে আসি, পরে ভাত খাব।

মহিম হাত মুখ ধুয়ে এল। অহল্যাও এল। বলল, তুমি ছেলেপান নও জানি, কিন্তুক মোর ভাবনায় যে তোমার এত রাগ, তা তো জানতাম না?

মহিম নীরব। অহল্যা আবার বলল, জেনে রাখলাম সে কথা। তবে সে ভাবনা মোর, মোরে বললেই এ অঘটন ঘটত না। মোর কাছে যে কথা, তা তুমি আর কাকপক্ষীরেও বল' না। আর এক কথা—

কিন্তু কথা আটকায় অহল্যার গলায়, বুক কাটে। বলল, এ নিজে

যদি তোমরা দু-ভায়ে বাড়াবাড়ি কর, তবে গলায় দড়ি দিতে হবে মোরে। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক।

মহিম বলল, থাকব। কাল থেকে মুই মাঠে যাব, মোরে কাজ ধরতে হবে।

কি বললা? গলার স্বর অহল্যার ছিঁড়ে গেল। বলল, যা নয় তা বল না।

দাদা তাই বলছে।

বলুক। অহল্যার যেন আসল মূর্তি খুলে গেল। বলল, যার যা, তার তা। মূর্তি তোমারে গড়তেই হইবে। তেমন দিন আসলে এই করেই খেতে হইবে তোমারে। এ ছাড়া তোমার পথ নাই।

আশ্চর্য! মহিম জানত এমন কথা পাগলা গৌরাঙ্গই বলতে পারত। কিন্তু পর-মুহূর্তেই অহল্যার চোখে হু হু করে অশ্রুর বন্যা এল।—এমন বুদ্ধি তুমি ছাড় ঠাকুরপো। এতে তুমি নিজেরে ভাঙবে, অপরকে মারবে। এ যে তোমার সাধনা! এ কি তুমি ছাড়তে পার? তারপর চোখের জল মুছে বলল, তেমন দিন যদি ভগবান দেয়, তবে তোমারে ভিক্ষে করে খাওয়াব আমি।

এবার স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক মহিম অহল্যার দিকে তাকিয়ে রইল। সে শিল্পী, তার সাধনা আছে। কিন্তু তার সাধনার পেছনে এতবড় একটা শক্ত খুঁটি আছে, তা বুঝি সে জানত না।

কয়েকটা দিন এমনি কাটল। মহিম মাটির কোন কাজেই হাত দিল না। সেই সকাল হলেই বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে প্রায় বেলা শেষে। কোনরকমে ছুটি খায় আবার বেরয়। অহল্যা খবর নিয়ে জেনেছে মহিম রীতিমত মাঠে যাতায়াত করছে, চাষের খবর নিচ্ছে।

মাঠে তো এখন বিশেষ কোন কাজ নেই, ধান পাকার সময় এখন। বিকালে বেরিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী আসে সে।

পরিণামে তার নিজের প্রতি পীড়ন যে আর একজনের প্রতি দ্বিগুণ প্রতিক্রিয়া করছে এ কথা সে বোধ হয় জানত না। শুধু তাই নয়, ব্যাপারটা অহল্যার সহের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। এমন কি, একদিন জমিদারবাড়ী থেকে পরান উমার ডাক নিয়ে এসেও ফিরে গেল। মহিম শুনল, কিন্তু গেল না।

(১৫

এর মধ্যে একদিন মহিম বাড়ী ফিরছিল। বেলা তখন নাবির দিকে আকাশে মেঘের ভিড় নেই, সূর্যের তেজ বড় প্রখর। কেমন যেন মাথা ধরিয়ে দেয়।

অক্ষয় জোতদারের বাড়ীর পিছনে ডোবাটার ধারে থম্‌কে দাঁড়াল মহিম। এ কি! দেখল হাড্ডিসার মোষ একটা চার পা মুড়ে ঘাড় সামনের দিকে বাড়িয়ে মাথা পেতে পড়ে আছে। চোখ দুটো নিষ্পলক সেই মোষের পিঠের উপর একটি মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে ফুলে ফুলে উঠছে। বোধ হয় কান্নায়।

মহিম তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে এল। দেখল মোষটা মৃত। ডাকল, কে গো?

যন্ত্রণাকাতর চোখের জলে ভরা মুখটা তুলল অখিল মোষের পিঠ থেকে। বলল, মোর কালাচাঁদেরে মেরে ফেলছে ভাই। বলতে বলতে তার কান্না বেড়ে উঠল।

মহিম বসে পড়ল অখিলের পাশে। জিজ্ঞেস করল, কি হইছে অখিলদাদা?

অখিলের বক্তব্যে মহিম বুঝল, অক্ষয় জোতদার দেনার দায়ে অখিলের জীবনভর সঞ্চয়ের ক্রীত কালাচাঁদকে নিয়ে আসে। কালাচাঁদের ভরণ-পোষণের থাকে অক্ষয়ের। তার জন্যও অবশ্য টা আলাদা হিসাবে দেনা ধরা হবে তার। কিন্তু সে চুক্তি প্রতিপালিত তো হয়নি, উপরন্তু না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছে

অখিল বলল, মহীরে, তোয়া দেখছিস্ দশটা যোয়ান মুনিষ কালা-চাঁদেরে দেখে কাছে ঘেঁষত না, যেন চারটে ষাঁড় সমান। আশা ছিল জীবনে যদি আর একটা হয় তবে কালাচাঁদের ভাই শামচাঁদ—এ তুজনারে নিয়া কোনরকমে তুটো চাকা বানিয়ে গাড়ী চালিয়ে খাব। সে গেল, কিন্তু কালাচাঁদ যে মোর কি ছিল, সেকথা কেউ বুঝবে না। রোজ জোতদারের গোয়ালের পেছনে এসে আদর করে যেতাম, আর কালাচাঁদের সে কি ফোঁস্ ফোঁস নিশ্বাস। মাঠে ঘরে কোথাও মোর শান্তি ছিল না। ঘুমিয়ে সেই নিশ্বাস শুনতাম মুই।

বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল। তার কালাচাঁদের সুখ্যাতি ও সোহাগের কথা মহিম শুনেছিল। কান্না বড় অসহ্য লাগল তার। বলল, ছেড়ে দেও অখিলদাদা, ঘরে যাও, মুই ডোমপাড়ায় একটা খবর দিয়া যাই।

দেখ, মহী।' অক্ষয়ের গোলা আর বিচুলির গাদা দেখিয়ে বলল অখিল, কত খাবার, বুঝি কয়েকবছরের, তবু মোর কালাচাঁদের দিনে তুটো আঁটিও জুটল না।

এমন সময় অক্ষয় জোতদার হেঁকে উঠল, ওসব কান্না মান্না রেখে যাবি ডোমপাড়ায়, না কি ধাষ্টামো করবি? এরপরে আবার পাওনা-গণ্ডার হিসাব টিসাবগুলান দেখে যা, ন্যাকামো রাখ্।

কথাগুলো যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল মহিমের মাথায়। সে অখিলকে উঠতে বলেছিল। কিন্তু বলে উঠল, না, ও থাকবে এখানে অক্ষয়কাকা, ওরে কাঁদতে দেও। তাতে তোমার পাওনা কমবে না। মুই যাই ডোমপাড়ায় লোক ডাকতে।

বলে সে উঠে পড়ল। যেতে যেতে শুনল অক্ষয়ের কথা, চাষার ব্যাটা কুমোর, ছুতোর হল বামুন—কতই দেখব। কিন্তু অক্ষয় ওসব থোড়াই কেয়ার করে।

মহিমের সামনে পথ মাঠ। কিন্তু মরা মোষটার মত নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি তার শূন্যে নিবদ্ধ। বার বার হোঁচট খেল, খেয়াল রইল না তার। এক দারুণ প্রতিক্রিয়া করেছে সমস্ত ঘটনাটা তার মধ্যে। শিল্পীর মন যেন কোথায় ছুটে চলেছে।

ডোমপাড়া ঘুরে বেলা শেষে সে বাড়ী ফিরে এল।

ভরত বাড়ী নেই। অহল্যা আজ সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে একটা বোঝাপড়া করার জন্য দৃঢ় অন্ধকার মুখে মহিমের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বলল, আজ যদি এতখানি পর হয়ে গেছি তবে বলি, তোমার জন্য কি মোর খিদে তেষ্টা নাই?

আচমকা আঘাতে আড়ষ্ট মহিম জিজ্ঞেস করল, মোর জন্য রোজ তুমি বসে থাক?

সে কথা থাকুক। চুলোয় যাক খাওয়া। আজ তোমাকে একটা বোঝাপড়া করতে লাগবে নইলে অনাছিষ্টি করব মুই। বলতে বলতে মহিমের চোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে চম্‌কে উঠল সে। কি যেন দেখছে মহিম। সমস্ত মুখে বেদনার আলোর বিচিত্র খেলা। মহিমের এ মুখ, এ চোখ অহল্যা চেনে। বলল, কি হইছে তোমার?

বুঝি কান্না পেয়েছে মহিমের। ফিস্ ফিস্ করে বলল, মুই কাজ করব বউদি, কাজ করব।

কিসের কাজ?

মহিম অখিলের সমস্ত ঘটনা বলে গেল। পরে বলল, সে মুই ভুলতে পারি না। কালাচাঁদের পিঠে পড়ে অখিলের কান্না, এ দুইয়ের মূর্তি গড়ব আমি।

মহিমের মাথার চুলের গাদায় দু-হাত ঢুকিয়ে অহল্যা তাকে

কাছে টেনে নিল। বলল, ছি, কেঁদ না। তোমার কাজ তো তোমারে করতেই হইবে। কিন্তু তার বুক ভরে উঠল আনন্দে। সে আনন্দের বেগ বুক ফাটিয়ে চোখে জলের ধারা বইয়ে দিল তার। আর এ জলের ধারাই বুঝি এ ক-দিনের সমস্ত সঙ্কট জ্বালা যন্ত্রণাকে ধুইয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বলল, পাগল নিয়ে কারবার। না জানি আবার কবে বেঁকে বসবে।"

বলে মহিমের মুখের দিকে মুহূর্ত তাকিয়ে পেছন ফিরে চলে গেল সে। যেন ভয় পেয়েছে সে এমনি ভাব। তারপর রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল সে। না, এ দুরন্ত কান্না বুঝি থামতে নেই, থামতে নেই। কেন?

তারপর শুরু হল কাজ। কিন্তু এ কি কাজ! একে বোধ হয় বলা চলে কাজের উন্মত্ততা। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বুঝি অন্য পরিবেশ নেই, জগতও নেই। মহিম মাথায় করে কিনে নিয়ে এল বিলাতীমাটি, তার সঙ্গে মিশাল নরম মাটি। তার এ কাজকে সে দীর্ঘদিন স্থায়ী রাখতে চায়। তাই দিনের পর দিন চলল শুধু মাটির অবিকল ছাঁচ গড়া অখিল আর তার মোষের সেই আলিঙ্গনের মর্মভেদ ছবি। সেই ছাঁচে ঢালা হবে বিলাতীমাটি, কাদা মাটীর ও আরও নানান্ বস্তুর মিশ্রিত মশলা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, কলকাতার ময়দানে বড় বড় মূর্তি, সবই ফিরিঙ্গি সাহেব মেমদের। মনে হয়েছিল, বুঝি বাংলা দেশ নয়, দেশ সাহেবদের। সেসব নাকি ঢালাই ধাতুর তৈরি। কিন্তু হাঁ, কারিগর বটে! কি সুন্দর কাজ! আর মহিমের এ কালাচাঁদ আর অখিলের মূর্তি কোথায় থাকবে? কোন্ ময়দানে, কোন্ পথের ধারে?

যাক্ সে ভাবনা, তার উঠোন তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

মহিম বুঝি পাগলই হয়ে গেছে। কাজ আর কাজ। নিষ্পলক চোখ, কখনো ঘাড় বাঁকায়, আপনমনে কথা বলে, হাসে আবার গুম্ হয়ে বসে থাকে। প্রহর গড়ায়। কখনো মনে হয়, সে যেন নয়ন-পুরে নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে। কখনো দেখে বিরাট একটা মোষ আকাশের কোল ঘেঁষে ভয়াল বেগে ছুটে চলেছে! যার দিকে চায়, তাদের সকলেই যেন অখিল বলে মনে হয়। কাজের মাঝেই এক

অদ্ভুত আবেগে সে হঠাৎ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। সেটা পলায়ন নয়, যেন মায়ের কোলে স্তন পান করতে করতে হঠাৎ শিশু আনমনা হয়ে স্তন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, আবার স্তন মুখে গুঁজে দেয়, তেমনি এক খেলা। কখনো কখনো আপনমনেই তীক্ষ্ণ চোখে যেন লক্ষ্য করে, একটা মানুষের টুকরো টুকরো হাড় পড়ে আছে তার কাছে, তার প্রতিটি গ্রন্থির সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধতে গিয়ে সে যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দেহের থেকে আলাদা করে নেওয়া সমস্ত তন্ত্রী জট পাকিয়ে গেছে, কেমন করে সেসব সারা অঙ্গে ঠিক করে পরিয়ে দিতে হবে, যেন খেই হারিয়ে ফেলছে তার। তারপর আচমকা তার চোখের সামনে একটা জ্যান্ত মানুষের ভেতরটা যেন ধরা পড়ে যায়। একটা অদ্ভুত কল্‌কল্‌ শব্দে দিকে দিকে রক্তের ওঠা-নামা, বিচিত্র ভাঁজ মাংসের, তার ভেতরে একটা অন্ধ গুহা। সেখানে কিছু বা দেখা যায়, কিছু যায় না। এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা।

অহল্যা তাড়া দেয়, ধরে নিয়ে যায়, ধমক্ দেয়।—যাও নেয়ে এস, না হইলে সব গোবর গণেশ করে দেব।

খাওয়া ভুললে রেখে দেব কিন্তু রান্নাঘরে পুরে কুলুপকাটি এঁটে।

ভরত দূর থেকে উঁকি মারে, হুঁকোটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নেয়, বাঁ হাত থেকে ডান হাতে। ভাবে, ছোঁড়ার চোখে মুখে কি যেন রয়েছে। এতই আপন ভোলা যে, ভরত গিয়ে তার স্বাভাবিক মর্যাদায় একটু টিটকারি দেবে, তাও প্রাণ চায় না। মনে বলে, পাগল কি আর গাছে ফলে? ··· কিন্তু পরমুহূর্তেই নিশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে তার বুক। সমস্ত ছোটখাটো মামলাগুলোতে তার গো-হারা হয়েছে। সত্য, সে পরকে ঠকিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। রহিম তাকে শনি বলে গাল দিয়েছে। কিন্তু আজ সরাসরি

জমিদারের সঙ্গে মামলায় যদি তার পরাজয় হয়, তবে এ ভিটে যে চাটি হবে! সবই তো গেছে জমিদারের গর্ভে, বাকি খুব সামান্যই। তাকে ঠেকোজোড়া দিয়ে রাখতে কি ভরত পারবে!

তবে এ হল তার নিতান্তই একলার ভাবনা। নিতে চাইলেও এর ভাগ সে কাউকে দেয়নি। সে একাকীত্বের কথা মনে করে নিশ্বাস সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না!

এর কিছু দুশ্চিন্তা অহল্যারও আছে, তবে তার কিছু করবার নেই। সে দেখে, মহিম এত সমস্ত কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে কেমন যেন উন্মনা হয়ে ওঠে, আশেপাশে কেবলি তাকায়।

অহল্যা জিজ্ঞেস করে, কারে খোঁজ, কি চাই?

বার বার এড়িয়ে গিয়ে শেষটায় মায়ের কাছে শিশুছেলের মত বলে, কুঁজো মালা তো আসল না বউদি, সে কি নয়নপুরে আসে নাই?

ও মাগো! অহল্যা হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, এই কথা? তুমি কি তুমি আছ যে দেখবে? সে আসল, দেখল, হাত মাত বুলিয়ে কত রঙ্গ করল। তা এতক্ষণে সে বোধ হয় রাজ্য মাতিয়ে বেড়াচ্ছে।

বটে! কুঁজো কানাই এর মধ্যে ঘুরে গেছে। কিন্তু সে তো কিছু বলল না মহিমকে। তার আবেগদীপ্ত চোখের দিকে তাকালে যে মহিম অনেককিছুর হদিস পায়। মানুষটা পাশে থেকে বকবক করে, বিচক্ষণের মত কখনো বা চোখ কুঁচকে ভ্রূ তুলে মহিমের কাজ দেখে, হাসে, মাথা নাড়ে। মহিমের মত সেও যেন পুতুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সাধনায় আত্মসমর্পণ করেছে। সামনে থাকলে টের পাওয়া যায় না সে কতখানি। না থাকলে বড় ফাঁকা লাগে।

সেই রাত্রেই কুঁজো কানাই এল। রাত্রি তখন গভীর। ভরন্ত অহল্যা শুয়ে পড়েছে। মহিমের ঘর অন্ধকার, সে বসে আছে দাওয়ায়। ঘুম নেই তার চোখে। না, কখনোই নয়। হাাঁ, এমনিই তার কাজের দুরন্ত বেগ যে, আবেগ ও চিন্তা বলে বস্তুটা যতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে না পড়ছে ততক্ষণ ঘুম নেই তার।

অন্ধকারে হাত আর মাথা দুলিয়ে কানাই আসছে দেখেই মহিম চিনতে পারল। পেছনে পেছনে পাড়ার কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আসছে। পেছন ফিরে কানাই তাড়া দিতে কুকুরগুলো খেপে ওঠে আরও। কানাই তাড়া দিয়ে হাসে।

মহিম তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে কুকুর তাড়িয়ে কানাইয়ের হাত ধরে!—এখন আসলা যে কানাইদা?

মহিমের কোমরে হাত দিয়ে কানাই বলল, চিনি তো তোমারে। জানি যে, ঘুম নাই তোমার চ'কে। তা, দেখ না, পাছে লাগছে পাজীগুলান।' দাওয়ায় উঠে বলল, রাতে-বেরাতে তো বার হই না। কুকুর তাড়া করে, গাঁয়ে ঘরে মেইয়েমানুষরা ভয়ে ডুকরায়, গালি দেয় লোকে। কিন্তুক্ না আইসে পারলাম না একটুস্খানি।' তারপর খাড়া হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে মহিমের কাঁধে হাত দিয়ে মাথাটা তার নামিয়ে নিয়ে আসে নিজের মুখের কাছে। বলে, অ'খলে আর তার মোষের পিতিমে গড়তে লাগছে দেখে পরান মোর কেবলি বলছে, তুমি যেন দেবতা।

কেন কানাইদা?

দেবতা মানুষকে কি এত ভালবাসে? সে যদি তোমায় ছটাক-খানেক ভালও বাসত অখলেকে তবে বুঝিন্ এমনটা হইত না।

এ যে কুঁজো কানাইয়ের পোড়া প্রাণের জ্বালা, তা জেনে বিস্মিত

বেদনায় স্তব্ধ রইল মহিম। দেখল, কানাই নিজের মনে মাথা দোলাচ্ছে। বলল, দেবতা নয়, সে কান্না, সে ছবি যদি তুমি দেখতে কানাইদা!

জানি জানি, মোরে বলতে হইবে না।' বলে আরও চিন্তামগ্নভাবে মাথা নাড়ে কানাই।

একটু চুপ থেকে মহিম বলল, মোর চোখে ঘুম নাই সে তুমি জান তো কি বলে খবর না দিয়ে গাঁ ছাড়লে তুমি?

কানাই হেসে তাড়াতাড়ি মহিমের হাত নিয়ে নিজের গায়ে মাথায় বোলাতে লাগল। বলল, খানিক লজ্জায়, সে মোরে সবাই বলছে তুমি নাকি পাগলাপনা হইছিলে। তারপর চোখে দ্যুতি ফুটিয়ে কিসকিস করে বলল, সেও এক মস্ত কাজ। এবার যে যার ধান কেটে নিয়া আসবে, ঝাড়াই মাড়াই করবে। তা সে জমিদারই হোক্ আর যাই হোক্। তোমার জমিতে খাটি, তোমার জমিতে বাস করি, তা বলে কি তোমার গোলাম থাকব? কাজ নাও, দাম দাও, হ্যাঁ। শুধু এই নয়, বাড়তি খাজনাও বন্ধ। অক্ষয় জোতদারের সঙ্গেও খুব একটা কিছু হবে ধানের ভাগ দখল নিয়ে। গাঁয়ে ঘরে ওরা মোরে দেখতে পারে না, জানোয়ার বলে। কিন্তুক্ যখন কাজের কথা বলল, মহী পরানটা মোর জেগে উঠল। খবরদার বলো না যেন কারুকে এসব কথা, মানা আছে।

কুঁজো কানাইয়ের গোপন কথা যে মহিম জানে, তা, সে প্রকাশ করতে চাইল না। মহিম বলল, তা তুমি আস নাই কেন এতদিন? নয়নপুরে কি ছিলে না?

কানাই যেন মহিমকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত বলল, ছিলাম গো ছিলাম। গাঁয়ে ঘরে ঘুরে ঘুরে ভাবটা দেখছি একটু, মনিব জনে কি বলে। আর, সবারে বললাম তোমার নতুন কীর্তির কথা। আবার

মহিমের ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল চোখ বড় বড় করে, কাল হইলু বোধন, সবাই পিতিমে দেখবে। তোমার [illegible] পিতিমে দেখতেও যে আসবে সবাই। কাজ তোমার শেষ হইবে কবে?

এইবার শেষ হইবে। তুমি না আসলে থাকলে মোর ভাল লাগতো না।'

'বটে কথা।' মাথা দুলিয়ে হাসল কানাই। বলল, 'তুমি শুধু মোরে লয়, অখলের মোষটারেও ভালবাস। তবু তুমি কুঁজো লও।' বলে, আর একদফা মহিমের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আসব, কাল আসব।

তারপর ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করে আবার ঘুরে দাঁড়াল, কি ভেবে মাথা দুলিয়ে হাসল, নাল ঝরল খানিক হা করা তার মুখের থেকে। চোখ ঠেলে উঠল কপালে। বলল, তবে বলি একটা কথা।

মহিম বলল, কি কথা কানাইদা?

কানাইয়ের ঠেলে ওঠা চোখের দৃষ্টি অন্তরাবদ্ধ হয়ে উঠল। ফিস্ ফিস্ করে বলল, কালু মালার সোন্দরী মেইয়ে সোয়ামীর বেড়ন খেয়ে কুরচিতলায় পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে, সে মূর্তি কি গড়া যায় না?

হাসতে গিয়ে হঠাৎ বুকের কাছে খচ করে কি যেন বিঁধে গেল মহিমের, কথা বলতে পারল না।

পরমুহূর্তেই কানাই হো হো করে হেসে উঠল। মিছেমিছি কেমন খেপালাম তোমারে, পাগল খ্যাপা।

বলতে বলতে অন্ধকার উঠোনে নেমে ছুটে চলে গেল সে। সে অন্ধকারেও মহিম স্পষ্ট দেখতে পেল একটা মানুষের পিঠে যেন কালো কুৎসিত অপদেবতা বোঝার মত চেপে তার নৈশ অভিজানে বেরিয়েছে। যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে একটা ভারবাহী পশু।

ওদিকে খুট করে একটা শব্দ হল। অহল্যা বেরিয়ে মহিমের কাছে এসে বলল, কে, কুঁজো মালা আসছিল বুঝি?

হ্যাঁ।

অহল্যা বলল, নেও, পরানটা ঠাণ্ডা হইছে?

অন্ধকার থেকে চোখ সরল না মহিমের। বলল, পরান যে ঠাণ্ডা হয় না কভু; সেখানে মোর কেবলি আগুন আগুন। তারপর অহল্যার দিকে তাকিয়ে বলল, বউদি, এ এগতে সবার পরানেই বুঝি আগুন। কুঁজো মালারও।

আগুন। অহল্যা দেখল অন্ধকারেও মহিমের চোখ যেন জ্বলছে। হ্যাঁ, বুঝি সবার পরানেই আগুন। সে আগুন কি, কিসের, কখন কেমন করে, কিরূপে মানুষের প্রাণের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে ওঠে তার কোন হদিস জানা না থাকলেও আগুনের আঁচ লাগে নির্বাক অহল্যার। সে তরতর করে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে গিয়ে মুহূর্ত থেমে বলল, রাত মেলাই, শুতে যাও। তারপর উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল! এ বিশ্ব সংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন, আগুন মানুষের বুক ভরা, পেট ভরা। সে কথা কি বলে দিতে হবে অহল্যাকে? না, ওগো না! অহল্যাকে তোমরা যে যা-ই ভাবো, তার বুকভরা আগুনকে যে নজরেই দেখ, সে জ্বালা যে শুধুই তার। নিরন্তর দহন যে মাত্র একলার।

পরদিন গড়ানবেলায় ভরতের উঠোনে মানুষের মেলা লেগে গেল। সকলেই মাঠের আর খালের মানুষ। সকলেই ঢুকে একবার করে হাঁক দিল, মহিমের নাম ধরে। এমন কি রাজপুরের মানুষরাও বাদ যায়নি। মহিম কাজ ছেড়ে সবাইকে আপ্যায়ন করল, বসাল।

কিন্তু কাজ তো মহিমের শেষ হয়নি। না হোক্, নিজের মনের কাছে মহিমের গোপন রইল না, প্রাণ তার পেখম তুলে নাচতে চাইছে, বুকটা তার ভরে উঠছে। নিজেকে সে জিজ্ঞাসা করল, একেই কি বলে সৌভাগ্য। তার মনে পড়ল উমার আহ্বান, কলকাতায় চল। কলকাতা! সত্য, কলকাতা চুম্বকের মত সমস্ত কিছুকে টেনে নিয়ে থরে থরে নিজের বুকে সাজি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই মানুষ, অখিল তারা তো কলকাতায় নেই। নেই কোন পরিচয়, তার কোন নাড়ীনক্ষত্রের সন্ধান। সে টান, সে আত্মীয়তা কোথায়? সবটাই যেন এক বিরাট চাঞ্চল্য, অথচ প্রাণহীন। যেন ফেল' কড়ি বোলের মত সবটাই বিকানোর মর্যাদায় উজ্জ্বল। হৃদয়ের রক্তে সেই উচ্ছ্বাসের ধারা নয়নপুরে যত অনাবিল, কলকাতায় তার অন্তস্রোতের গতি খোঁজার চেয়ে ওতে প্রাণভরে ডুব দেওয়া অনেক শান্তির। এই কাদা মাটি মাখা, মা ধরিত্রীর গায়ের গন্ধ মাখা মানুষের এই প্রাণখোলা আভনন্দন।

মহিমের বিনয়বাক্য গ্রাহ্য না করে সবাই তার প্রায়-সমাপ্ত কাজ দেখার জন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল। দেখা তো সবে শুরু। কবে তার শেষ, মহিম তার কি জানে।

অহল্যা মানুষজন দেখে আর উঠোনে বেরুতে পারে না। এদের মধ্যে অনেকেই তার শ্বশুর ভাসুর সম্পর্কের জ্ঞাতি এবং পড়শী আছে। সে ঘোমটা টেনে রান্নাঘরের বেড়া কাটা জানালা দিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল দখিন ভিটার ঘরের ধারে সকলের আড়ালে পিপুল তলায় ভরত হুঁকো টানা ভুলে ভিড় দেখছে। অমনি বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল তার। যেন এ উৎসবের আসরে তার আসতে নেই। যেন অনাহূত, তবু না এসে পারেনি। কেন? এখানে ভরতের অধিকারই তো সবচেয়ে বেশি। তবু সে কেন পরবাসীর মত আড়ালে রয়েছে?

হ্যাঁ, ভরত খানিকটা তাজ্জব, খানিকটা অসন্তুষ্ট, খানিকটা সন্তুষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে আর আর ভাইয়ের এ কেরামতিটা তারিফ পাওয়ার যোগ্য কি-না তাই বোধ হয় ভাবছে। তার হঠাৎই মনে পড়ে গেল, তার বিয়ের পর এত মানুষ এ ভিটেয় আর কোন দিন পা দেয়নি। তারপর বাড়ীর দোরগোড়ায় ওর শ্বশুর ও সম্বন্ধিকে দেখে সে চমকে উঠল এবং তার বিস্ময়কে পাহাড়সমান তুলে দিয়ে মহিম তাদের উভয়কে প্রণাম করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। ইস্! ছোঁড়া মানুষ ভোলাতে একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছে। তার মনের মধ্যে ছোট্ট একটা কাঁটা হঠাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এই মনে করে, কই, সে তো কোনদিন পীতাম্বর বা ভজনের পায়ের ধুলো নেয়নি। যেন আসল সম্বন্ধটা তাদের তার ভাইয়ের সঙ্গেই।

তারপর হঠাৎ আমলা দীনেশ সান্যালের গলার স্বরে সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। সান্যালের মুখে এক অদ্ভুত ব্যাজহাসি। মহিম সামনে এসে দাঁড়াতেই বলল, কি রে, কি এমন জানোয়ার গড়লি যে, সব গ্রাম ভেঙে পড়েছে উঠোনে?

লোকটার আবির্ভাবে ও কথায় সকলেই রুষ্ট হয়েছে বোঝা গেল। মহিম বলল, কাজ তো শেষ হয় নাই, শেষ হইলে দেখতে আসবেন। নিমন্ত্রণ রইল।

সান্যাল হো হো করে হেসে উঠে উঠোনের মানুষগুলোকে দেখিয়ে বলল, এরা বুঝি অনিমন্ত্রিত? তুই ব্যাটা কথা শিখেছিস্ বেশ। চল্ না দেখি, কি আর্ট ফলালি। বাবুরা তোকে আবার আর্টিস্ট বলে।

সান্যাল দু-পা এগুতেই মহিম স্পষ্ট গলায় বলল, এখন দেখানো যাবে না সান্যাল মশাই।

মহিমের পাশ থেকে ভজন বলে উঠল। জানোয়ার পুরো তৈয়ারী না হইলে আপনি বুঝতে পারবেন না সানেলমশাই, কেমন জানোয়ার ওটা।

বটে? সান্যালের মুখে মুহূর্তে কয়েকটি ক্রোধের রেখা ফুটে আবার মিলিয়ে গেল। হেসে বলল, ভজন বুঝি? তা ভগিনীপতির সঙ্গে সব গোলমাল কাটিয়ে নিয়েছিস্? বেশ করেছিস্। শুনেছিলাম ভরতকে পেলে নাকি তুই ঠেঙিয়েই একশ' করবি। আবার সেই ভিটেই চাটতে এলি যে বড়?

মহিম অত্যন্ত গভীর হয়ে বলল, সান্যালমশাই, ভজনদাদা আমার অতিথি।

ভাখো ব্যাটার মরন। আমি কি বলছি অতিথি নয়? জিজ্ঞেস করছি বিবাদ মিটে গেল নাকি?

ভজনের চোখ ধক্ ধক্ করে জলছে। বলল, কথা তোমারে শিখোতে পারি সানেলমশাই কেমন করে কথা বলতে হয়। তবে ভাবি, একেবারেই, না, তোমার বাক্ থ' মেরে যায়।

বলে, সে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সান্যালের জিভটা সে টেনে

ছিঁড়ে ফেলবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভরত পিপুলতলা থেকে সামনে এসে হাজির হল। বলল, সানেলমশাই, কাজ যদি তোমার শেষ হইয়ে থাকে, আপন কাজে যাও গিয়া। বেথা সময় নষ্ট।'

সান্যাল তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, এই যে ভরত। তোমার কাছেই এসেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। কর্তা বলছিল, তুমি যদি আপসে একটা মিটমাট করতে চাও তা হলে একবার কাছারিতে যেও। এমনিতেও তো তুই—

ভরত বাধা দিয়ে বলে উঠল, তোমার কর্তারে যেয়ে বলো, ভরত নিজের কাম করতে জানে, অপরের পোয়োজন নাই।

এই তোমার জবাব? কুটিল সান্যালের মুখ।

বুঝতে পারলা না?

তা পারব না কেন? আবার হাসল সান্যাল। মহিমকে বলল, কর্তা তোকে একবার কাল সকালে যেতে বলেছে, বুঝলি? উনিই পাঠিয়েছিলেন তোর আর্টের নমুনা দেখতে, তাই এসেছিলাম। বলে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিজের মনেই সান্যাল বলল, হুঁ ব্যাটারা খুব বেড়েছে। তারপর লাঠি ঠুকে ঠুকে সে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সকলে চমকিত এবং কিছুটা মুগ্ধও হয়েছিল বটে ভরতের কথায়। মনে হয়েছিল, ভরত যেন সত্যই আর তেমন দূরে নয়।

ভরত তাকাল ভজনের দিকে। ভজনও তাকিয়েছিল। মনে হল তারা উভয়েই বুঝি কথাবার্তা শুরু করবে। এমনি স্তব্ধ অপেক্ষমান রইল।

কিন্তু না। ভরত হঠাৎ মহিমের দিকে ফিরে বলল, যত সব অনাছিষ্টি, আকাম। কিন্তু কোন বিদ্বেষ নেই তার গলায়।

আর একটি কথাও না বলে সে সেখান থেকে সরে গেল।

সকলেই নির্বাক এবং কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল, ভরত কাছে এসে সরে গেল বলে। ভাবটা কতক্ষণ থাকত বলা যায় না। এই সময় অখিলের দশ বছরের ছেলে ছুটে এসে মহিমকে কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, মহিকাকা, কালাচাঁদটারে মোরে দিতে হইবে।

মহিম হাসল।—কেন রে?

মুই রোজ ঘাস কেটে এনে খাওয়াব। নাওয়াব খালে। মরে গেলেও আর দিব না কাউকে!

সকলেই হেসে উঠল, কিন্তু আনন্দে নয়, দুঃখে।

এইদিনই সন্ধ্যাবেলা পরান এল মহিমকে ডাকতে। উমা ডেকেছে মহিমকে। অহল্যা তখন তাড়াতাড়ি কুড়োল দিয়ে খান কয়েক মোটা কাঠ ফেঁড়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ উমার ডাক নিয়ে মহিমকে আসতে দেখে আজ সে শুধু চমকাল না, মনের মধ্যে কেন প্রশ্নটা আজ অন্যরকম ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে উৎকর্ণ হয়ে রইল মহিমের জবাবের জন্য।

মহিম আর কুঁজো কানাই তখন ঘরের মধ্যে। মহিম বেরিয়ে এসে বলল, আজ আমি যেতে পারব না পরানদা, কাল সকালে কর্তা ডাকছে, সেই সময় যাব।

পরান ফিরে গেল। কিন্তু সে বড় বিমর্ষ।

পরদিন সকালে এক ঝাঁক বিস্ময়ের মত উমা এসে হাজির হল মহিমদের বাড়ীতে, সঙ্গে পরান। খালি উঠোন দেখে পরান ডাকল মহিমকে। বেরিয়ে এল অহল্যা।

দুটি নারীই পরস্পরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। যেন বহুদিনের দুটি চেনা মানুষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছে। পরমুহূর্তেই পরান কিছু বলবার আগেই অহল্যা ঘোমটা তুলে দ্রুত এগিয়ে উমার পায়ের ধুলো নিল। বলল, বৌঠাকুরানীরে মুই চিনি।

জীবনে কোনদিন উমাকে চোখে না দেখলেও যেন তার অন্তরই এ নারীটির পরিচয় বলে দিল তাকে।

উমা বললে, থাক্ থাক্। তোমার দেওর কোথায়?

অহল্যা জবাব দেওয়ার আগেই মহিম তর্‌তর্‌ করে তার ঘরের থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমে এল। ভুলক্রমে পায়ে হাত দিতে গিয়েও সে সামলে নিয়ে কপালে হাত ঠেকাল। বলল, আপনি আসছেন! আমি যে যেতাম এখনি?

গাম্ভীর্য সরল উমার মুখের, চোখ হল ভক্তিমতীর। চোরা অভিমানে বলল সে, যেতে বলেই এসেছি। এসেছি তোমাকে শায়েস্তা করতে। কোথায় তোমার ঘর?

শুধু বিস্ময় নয়, সকলে কিছুটা বিভ্রান্তও বটে ভরত পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে হুঁকো হাতে।

মহিম হেসে তাড়াতাড়ি বলল ঘর দেখিয়ে, এইটে। আসেন।

কিন্তু উমা আর সবাইকে যেন ভুল ভাঙার জন্য বলল, কি নাকি এক কাণ্ড করেছ তুমি যে, জগতে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তাই দেখতে এলাম।

বলে সে মহিমের সঙ্গে তার ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই স্তব্ধ বিস্ময়ে সে সমাপ্ত অখিল ও তার মোষের মূর্তি দেখে থমকে গেল মুহূর্ত। পরমুহূর্তেই তাড়াতাড়ি মূর্তির কাছে গিয়ে যেন পাথর হয়ে গেল। একি গড়েছে তার শিল্পী! মৃত মোষ, তার উপরে মুখ গুঁজে পড়া

মানুষ। সমস্তটা যেন নিষ্ঠুর কান্নায় ভরা। এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় বুকে নিশ্বাস আটকে দেয় যেন কালো মোষটার অসহায় ঘাড় এলিয়ে পড়া ভঙ্গি আর তারই মত কালো মুখ থুবড়ে পড়া মানুষটার হাড়পাঁজরা। হাড়পাজরার অভিব্যক্তি যে অবুঝ কান্না বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার বেগ, তা সুস্পষ্ট।

সমস্ত পরিবেশটাকেই যেন যন্ত্রণায় ও কান্নায় ভরে তুলেছে মূর্তিটা। দেখতে দেখতে মহিমও সম্বিত হারাল।

অনেকক্ষণ পর উমা চোখ ফিরিয়ে সমস্ত ঘরটা খুঁটে খুঁটে দেখল। এক মুহূর্ত বেশি চোখ আটকে রইল তার আবক্ষ গৌরাঙ্গসুন্দরের মূর্তির দিকে। তারপর ফিরল সে মহিমের দিকে। সে আত্মভোলা শিল্পীর দিক থেকে চোখ আর সরল না। সরল না নয়, উমা পারল না। বুঝি উমা নিজেকেই চেনে না।

মোষের মূর্তি আড়াল করে উমা এসে দাঁড়াল তার সামনে। মহিমের সম্বিত ফিরল, চোখের পাতা নড়ল, দৃষ্টি রইল স্থির। এত কাছে উমার সেই চোখ, আজ তাতে বিচিত্র আবেগ, ঠোঁটে মোহিনী হাসি। এত কাছে, স্পন্দিত বুকের আবরণের কম্পন দেখল আর শুধু নাসারন্ধ্র নয়, চিন্তার অনুভূতিটুকুকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলল উমার সর্বাঙ্গের বিচিত্র মধুর গন্ধ। প্রাণে সাহস যুগিয়ে মহিম স্পষ্ট তাকাল উমার চোখের দিকে।

উমা বলল, আস্তে আস্তে, কি দেখছ, আমাকে গড়বে?

আপনাকে? কথার স্বর আবার যেন মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল মহিমকে। বলল, আপনার মূর্তি?

কেন, গড়বার মত নয়? যেন উৎকণ্ঠা এসে পড়েছে উমার কণ্ঠে, বুঝি জীবন-মরণের প্রশ্ন। শিল্পীর সামনে তার মতোটি করে তুলে

ধরবার জন্য উমা দু-হাত শাড়ী থেকে মুক্ত করে, ঘোমটা সরিয়ে আঁচল টেনে দিল একটি সরু নির্ঝরের মত, দুই উন্নতস্তনের মাঝখান দিয়ে। নীল আমার প্রতিটি রেখায় সুস্পষ্ট সযত্ন রক্ষিত যৌবন। ঘাড় বাঁকিয়ে ঈষৎ পেছনে হেলিয়ে বঙ্কিম ঠোঁঠে হাসল সে। বলল, বল, আমাকে গড়বে?

মহিম স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল, গড়ব।

তবে এখানে নয়, কলকাতায়।

আবার স্বপ্ন ভাঙ্গে মহিমের। কলকাতায়?

হ্যাঁ। উমা আরও সামনে এসে বলল, যাবে না? আমার শ্বশুর তোমাকে টাকা দিয়ে রেখে দিতে চান তার হুকুম তামিলের জন্য, তুমি তাই থাকবে?

না।

তবে চল কলকাতায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অহল্যা এসে ঢুকল। মুখে সামান্য হাসি। কিন্তু সে নিজেই বোধ হয় জানে না তার চোখের দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ সন্ধানী হয়ে উঠেছে।

উমা নিজেকে সামলে বলল হেসে, তোমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও মণ্ডল-বউ, নয়নপুর ওর জায়গা নয়।

অহল্যা হাসল। নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সে হাসি। উমা তার জীবনেও কি এমন তীব্র শ্লেষের হাসি দেখেছে! মহিমের সে হাসি দেখে মনে হল, এক দারুণ ঝড় পাকিয়ে ওঠার মত আকাশের কোন্ এক কোণ থেকে যেন হু হু করে কালো মেঘ অজানতে কখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সারা আকাশে।

অহল্যা বলল, পাগলাঠাকুর নিয়ে গেছিল ওরে কলকাতা, রাখতে পারে নাই বৌঠাকুরানী।'

'আমি পারব।'

অহল্যা তেমনি হেসে বলল, 'বৌঠাকুরানী, মোরা হইলাম গরীব চাষী গেরস্থ, একটুকুন ঠাঁই নাই যে বসতে দেই আপনারে। আপনাদের কাছে ও দুদিন বই তিনদিন থাকতে পারবে না।'

তারপর হঠাৎ সে বড় সরল ভাবে হেসে উঠল। বলল, মোর হতভাগা দেওরের আপন-পর চেতনও বড় বেশি ঠাকুরানী। পাগলা ঠাকুর ওরে ধরে রাখতে পারল না বলে কি বেড়নটাই দিছিল, এই মোর চোখের সামনেই।

সেই স্মৃতিতে আবার অহল্যার চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলে উঠল। উমার চোখেও বিস্মিত অনুসন্ধান। ঠিক যেন চিনে উঠতে পারছে না অহল্যাকে। এ যেন কিষাণী মণ্ডল বউ নয়, আর কেউ। চিন্তায় বুদ্ধিতে শাণিত প্রখর। অহল্যা চকিতে একবার মহিমকে দেখে বলল, তবে দেওর তো মোর আর ছেলে-পান নাই, যায় তো ওরে আটকায় কে? তবে মোরা পারি না ছাড়তে পরান ধরে।

বলে সে উমার মুখে ছায়া ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কি সরল আর সাদা উক্তি। উমা ফিরল সে ছায়া নিয়ে মহিমের দিকে। বুঝল, শুধু তার শ্বশুর নয়, শিল্পীকে তার প্রশস্ত মর্যাদায়, আলোকিত আশ্রয়ে টেনে নিয়ে যেতে আর যে বাধা আছে তা বোধ হয় দুর্লঙ্ঘ্য। তবু নিরাশ সে মোটেই হল না। বলল, পুজোর ক'দিন নয়, কোজাগরী পূর্ণিমার দিন পরানকে পাঠাব সন্ধ্যায়, ফিরিও না যেন ওকে। অনেক কথা, আছে তার মনস্থির করতেই হবে তোমাকে। যেও কিন্তু সেদিন?

মহিম তাকাল উমার দিকে। না, এখনও ওই চোখের সামনে প্রতিবাদের ভাষা সে কিছুতেই জিভে যুগিয়ে তুলতে পারছে না। একি স্বপ্ন, না, সম্মোহন! সে বলল, যাব।

উমা ফিরল। কিন্তু মুখের ছায়া মনেও চেপে বসতে চাইছে যেন। ...

পূজোর ক-দিন মহিম অন্য কিছু ভাববার সময় পর্যন্ত পেল না, এমনিই একটা ভিড় লেগে রইল বাড়ীতে। এমন কি নহাট মহকুমা থেকে কেউ কেউ এসেছিল তার কাজ দেখতে। কেবল দেখতে পেল না সে গোবিন্দকে, বনলতাকে তার দুটি প্রিয় বন্ধুকে। আর অখিলকেও সে আজ পর্যন্ত পায়নি তার উঠোনে। আর একজন .... সে বোধ হয় কোন দিনই আসবে না। সে হল পাগলা গৌরাঙ্গ।

আর খানিকটা বিস্ময়ের ঘোর লেগে রয়েছে তার মনে অহল্যার নিস্তেজভাবও থেকে থেকে অপলক অনুসন্ধানী চোখে মহিমের দিকে চেয়ে থাকা। কেন? ...

কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন বিকালবেলা গোবিন্দ আচার্য্যির বাড়ী থেকে রাজপুরে ফিরছিল। এখনও সে তেমনি আত্মহারা, যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট মুখে। যে জগৎ তার কাছে বেতাল লেগেছে, তার তালই যে শুধু আজ পর্যন্ত পায়নি, তা নয়। সমস্ত বেতালটা আজ তার মস্তিষ্কে অগুনতি হাতুড়ি পেটানোর মত পিটিয়ে চলেছে। পাগলা বামুনের সঙ্গে তার নিত্য কথা বাদ-প্রতিবাদ জানাজানি চলেছে। ভগবান নেই বা না-মানার স্বপক্ষে নয়, বাস্তব জগৎ সম্পর্কেই লক্ষ কথা। শেষটায় পাগলাবামুন তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, গোবিন্দ বিনাশ্রমে ফাঁকি দিয়ে খায়। সে ধর্ম নিয়ে থাকুক, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যাক যেথায় খুশি, কিন্তু সংসারের হাড়-কালি-করা মানুষের শ্রমের খাবারে সে কেন উদরপূর্তি করবে? মানুষের সবটাই হাতে নাতে। সে তাঁর মগজে আর শরীরে খাটে, তাই সে খায়। তার কাজের শেষ নেই। কিন্তু গোবিন্দ! বুঝলাম, হয়তো সে মানুষের চিত্তশুদ্ধির দায়িত্ব নিতে চায়, কিন্তু তা ধর্মের নামে কেন? দেশবাসী নিরক্ষর, ক্ষুধার্ত। ধর্ম দিয়ে কি তা ভরাট হবে? ঘরে বাইরে কেবলি কলহ, বিবাদ, হানাহানি মারামারি, ঘৃণা আর নীচতা। তার মূল তো ধর্ম নয়, তার অভাব, তার সমাজব্যবস্থা। যার পায়ের তলায় মাটী নেই, ধর্ম তার মাথায় কি ফুল ফোটাবে আপ্‌সে! সে যুক্তি এমনই নিশ্ছিদ্র, বিভ্রান্ত গোবিন্দের মুখে একটা কথা যোগায়নি। আরও বলেছে গোবিন্দর চিরকাল

ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের সম্পর্কে যে,এটা হল রাজপুরের আচায্যির নিজস্বকার্য-সিদ্ধির স্বার্থের জন্যই। আচায্যি সেই পুরনো ধর্মের দোহাই তুলে তার প্রচার এবং নিজের আচায্যিপনাকে জাহির করবার জন্যই তার দরকার গুটিকয়েক নির্বিকার অবিবাহিত সংসারে কোন-কিছুতে-না-মজা কিছু যুবককে। আচার্যের বিবাহ তো দোষের হয়নি। তারপর আচায্যির ধর্মের আন্দোলনের যে মূলটা, সেটা কি দক্ষিণভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ও উত্থানের মুখে শঙ্করাচার্যের উদার ধর্মবিপ্লব এবং চৈতন্যের জাতিহীন ধর্ম আন্দোলনের সম্পর্কে গভীর আলোচনা এবং ভারতীয় সমাজের এই বিংশ-শতাব্দীর প্রায় অর্ধেকের মুখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পাগলাবামুন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে যে, আজকের আচায্যির এ আন্দোলনের উৎস মঙ্গলজনক তো নয়ই, ধর্মের তীব্র হলাহলে জাতির আত্মহারানোর পথ। কি মূল্য আছে আজ মসজিদের আদর্শে কতকগুলো একেশ্বরবাদীর জনাগার খুলে। আচার্য বলেছে তার কালী কৃষ্ণ এক, তার মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। বলে, নিজের মনের দিকে তাকাও। ভাল। কিন্তু মন্দির কেন? কেন অলৌকিকতাবাদ? কেন পেশা আর পয়সা। একটা সময় গেছে যখন হিন্দু ভদ্রপরিবার সমাজের নিস্পেষন সইতে না পেরে ব্রাহ্ম হয়েছেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু আজকের মানবসমাজকে এক ইঞ্চি এগিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও যে মানুষের আছে, ধর্মের দোহাই তুলে তা নিতান্তই অসম্ভব। একে বলে খোদার উপর খোদ্‌গিরি করা। মানলাম, ভগবানই যদি তোমাকে গড়ে থাকে, তবে গড়েছে তো মানুষ করে? তবে মানুষের মত মানুষ না হবো কেন? আমি করব আমার কাজ, অনাচার বাদ দিয়ে। বাঁচার পথে আছে অত্যাচার, অবিচার, আমি রুখব তাকে। তাতে যদি মরি, সে তো সবার বড় মরণ। যে আগুন

লাগায়, আমি তাকে পরাস্ত করে নেভাব আগুন। সে-ই তো বলি তবে সেবা। ভগবান যদি মঙ্গলময়, তবে এ-ই তার নির্দেশ নয় কি? নাকি আমাকে টানতে যেতে হবে তারই দোয়ার? কেন রে বাপু?

হ্যাঁ, স্তব্ধ নির্বাক থাকতে হয়েছে গোবিন্দকে। কেবলি ছুটে ছুটে গেছে আচায্যির কাছে। যুক্তি দাও, যুক্তি চাই। কিন্তু সেখানে যুক্তি নেই, কেবলি বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস। অন্তরে দুর্বার ঝড় নিয়ে তবু গোবিন্দ আচায্যির ভজনাগারে বসছে, ধর্মসভায় যাচ্ছে, প্রচারে যাচ্ছে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। কিন্তু সেই তেজ আবেগ বিশ্বাস কই!

আর এ চিন্তারই গাঁটে গাঁটে মিশে আছে বনলতার মুখ, বনলতার কথা। এরই ফাঁকে ফাঁকে চমক লেগেছে বনলতার এক একটি তীব্র কথা। বামুনের কথা জ্ঞানের মহিমায় গভীর, মার্জিত। বনলতার জীবনে ধ্যানের ভাষা অমার্জিত কিন্তু মূলত এক। সে হল, জীবনকে ছিনিয়ে নিতে হবে সব বাধা থেকে, প্রাণভরে বাঁচতে হবে। আর নিজেকে সে কেমন করে চোখ ঠারবে যে, বনলতার বলিষ্ঠ জীবন-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্ধত যৌবনের কাছে কেবলি তাকে মাথা নত করে পালিয়ে আসতে হয়েছে, কখনোই বুক টান ক'রে দাঁড়াতে পারেনি। অথচ শৈশবে মহিমের সঙ্গে তার বনলতাকে নিয়ে যে বউ দাবির বিবাদ হয়েছে, সে কথা মনে করে তার বুকের মধ্যে যে রঙ্গরসের জোয়ার, তা কি স্তব্ধ হয়ে গেছে? হায়, বনলতার অপলক চোখ আজ তার মত পুরুষকে পীড়ন করে। সে কি পলায়মান, সে কি কাপুরুষ বলে!

এমনি গোবিন্দের জীবনে চিন্তায় ধারণায় এক তুমুল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আবর্ত ঠেলে উঠতে গিয়ে প্রাণ তার ওষ্ঠাগত। অথচ মানুষ বলেই এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকাও চলে না।

এসব ভাবতে ভাবতেই খালের খেয়াঘাটে এসে দাঁড়াল নয়নপুর

যাবে বলে। সূর্য অস্ত যায়, পশ্চিম আকাশ লালে ধূসরে গোধূলীর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পূবে এর মধ্যেই মস্ত বড় চাঁদখানি উঁকি মারছে। দিনটির ঝলমলে বাহার দেখে কাকপক্ষীর এখনো ঘরে ফেরার কোন তাড়া নেই যেন। আজ লক্ষ্মীপূজো ঘরে ঘরে, সাড়া পড়েছে তার। নৌকা তখন ওপার ঘাটে যাত্রী নিচ্ছে।

ঘাটে খেয়া যাত্রী মাত্র একটি মেয়েমানুষ নয়নপুরে যাবার। গোবিন্দকে দেখেই মেয়েমানুষটি মস্ত একটি ঘোমটা টেনে দিয়ে সরে গেল। কিন্তু চকিতে সে মুখ দেখে চমকে উঠল গোবিন্দ। তার শৈশবের স্মৃতিপটে ও মুখ আঁকা আছে, তা তো ভোলবার নয়! এক দারুণ উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসল। সে বলল, ঠাকরুন্ কোথায় যাবে তুমি?

ঘোমটার আড়াল থেকে জবাব এল, নয়নপুর হাটের ধারে, মালীপাড়ায়।

কুণ্ঠায় মনটা দেবে গেল গোবিন্দের। মালীপাড়া যে খারাপ মেয়েমানুষের পাড়া! তবু বলল, রাজপুরের চক্কোত্তিদের ভাদ্দর বউকে চেন তুমি?

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। জবাব এল, চিনি।

তুমি কি ঠাকরুন সেই বউ?

ক্ষণিক নিশ্চুপ। মেয়েমানুষটি ঘোমটা খুলে গোবিন্দের দিকে ফিরে বলল, কিছু কি বলবে বাবা?

মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল গোবিন্দ। হ্যাঁ, সেই মুখ, সেই বিশাল চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, টকটকে রং। বয়সের ভারে সবই বিবর্ণ, ম্লান। রাজপুরের চক্রবর্তীদের ধর্ষিতা ভাদ্রবউ, গোবিন্দের বাবার

ভৈরবী শ্মশানচারিণী। আজ হাটের ধারে মালীপাড়ায় তার বাস। কেন, সেদিনের মত রক্তজবার অঞ্জলি কি আর তার পায়ে পড়ে না।

গোবিন্দ বলল, মোর খানিক কথা ছিল তোমার সাথে?

এখানেই বলবে?

না হয় মোর ঘরে চল।

ছি, মোরে ঘরে ডাকতে নাই।

তবে মালীপাড়ায় চল।

সেখানে কি পারি তোমারে নিয়া যেতে? বলে এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে বললে, না বলে যদি শান্তি না পাও তো, চল নয়নপুরের খালের ধারে শীতলা তলায়। সেখানে কেউ থাকবে না।

খেয়া পেরিয়ে গোবিন্দ চক্রবর্তীদের ভাদ্র বউয়ের সঙ্গে খালের ধার দিয়ে হেঁটে শীতলাতলায় চলে এল। জায়গাটা শুধু নির্জন নয়, এত নিস্তব্ধ এবং ঝোপে ঝাড়ে ছাওয়া যে গা ছম্ ছম্ করে। একটি মস্ত হিজলগাছের তলা মাটী উঁচু করে পাথরের নুড়ি দিয়ে তাতে শীতলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানুষ নেই কিন্তু দেখে মনে হয় নিয়তই কেউ শীতলা তলা লেপে পুছে পরিষ্কার করে রাখে। সেখানেই তারা উভয়ে এসে বসল।

গোবিন্দের মনে ঝড়ের এতই বেগ যে সে কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল তার বাবার সাধনার কথা, ভৈরবী জাগানোর মাহাত্ম্যের গূঢ় স্তোত্র, কারণ পান। সে শ্মশানের বীভৎস ছবি কথায় কথায় জীবন্ত হয়ে উঠল।

অন্ধকারে ভাদ্রবউ শুনল সব কথা, শুনে জ্বলতে লাগল তার চোখ। তবু সামান্ত হেসে বলল; এর মধ্যে ভগবানের কি লীলা আছে আমি তো তা জানি না বাবা। সেখানে কোনদিন ঈশ্বরও দেখি নাই,

মহেশ্বরও দেখি নাই। মোর চোখে ঘোর অনাচার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে নাই। দেখে মনে হইত তোমার বাবার চেয়ে ঘোর ঈশ্বর অবিশ্বাসী বুঝি আর নাই। তবে, তোমার মায়ের কঠিন ব্যামো না থাকলে বাপের তোমার কি সাধ্যি ছিল আপন জীবনটারে নিয়া এমন খেলা করে?

গোবিন্দর মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি গলা দিয়ে ঠেলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বলল, তবে ঠাকরুন্, তুমি কি ছিলে, কেন ছিলা? তোমার পায়ে সেদিন এত ফুল চন্দনই বা কেন পড়ছিল?

ভাদ্রবউয়ের চোখে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দিল, আবার মিলিয়ে গেল। সে তার অতীতের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। তারপর বলল ফিস্ ফিস্ করে কান্নাভরা গলায়, তখন মোর শেষ সব্বোনাশ হয়ে গেছে। পাছদুয়ারের পুকুরঘাটে ভর সন্ধ্যেয় আমার গা মুখ ভরা সমস্ত রূপের গরব দলে মুচড়ে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল। গেছিলাম গা ধুতে, সেই সময় আচমকা ধরে আমাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে রইলাম ভূত হয়ে। ঝোপে ঝাড়ে আঁধারে আঁধারে ফিরি গাঁ ঘরের বাইরে, মানুষের চোখের আড়ালে। শেষটায় স্বামীকে লুকিয়ে সব বললাম, কত অনুনয় বিনয়, কপাল কুটলাম পায়ে, পাথর গলল না। তখন তোমার বাবা একটা আচ্চয় দিল, ধম্মের আচ্চয়! ইস্! কি ধম্ম! শ্মশানে মদ মাংস খেলাম, তোমার বাবার ভৈরবী হইলাম, শিবের সাথে দেবী হইলাম। কি সাংঘাতিক! গাঁয়ে ঘরের মানুষ গেছে রোগ শোক মনস্তাপ নিয়ে আশীর্ব্বাদ ওষুধ নিতে। ফুল চন্দনের কথা বলছ? কেউ দিয়েছে বুঝে, কেউ দিয়েছে না বুঝে। বুঝে যারা দিছে তারা আজও যায় মালীপাড়ার মোর কাছে। পাপ যে এতবড় হইতে পারে তা জানতাম না।

শুনতে শুনতে হঠাৎ গোবিন্দর কাছে ভাত্রবউয়ের দুঃখই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল। সে নির্বাক, যন্ত্রণায় বেদনায় ক্রোধে দিশেহারা।

ভাত্রবউয়ের চোখে স্বপ্ন নেমে এল যেন হঠাৎ পূবের গাছপালার আড়ালে চাঁদ উঠতে দেখে ফ্যাকাসে চাঁদ সোনা হয়ে উঠছে, আগুন ধরা আকাশ। শীতলাতলার গাছ ঝোপঝাড়ের ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে যেন অনেক অশরীরি আত্মার মত। ভাত্রবউ বলল, পিতি বছর এই দিনটাতে আসি রাজপুরে ঘোমটা ঘোমটা টেনে। আসতে আসতে মনে হয়, পাপ তো কই করি নাই, আমি তো সোনা! হাঁ, এমন দিনেই বাপের বাড়ীর গাঁয়ে সদর-পুকুরের ধারে গেছি পাথরবাটি ধুতে, কোজাগরী লক্ষীপুজোর চিত্তির দেওয়ার পিটুলি গুলব বলে। গড়ান বেলা। ধুয়ে উঠবার মুখে দেখি এক সুন্দর পুরুষ, এ্যাই বুক, এ্যাই হাত আর কি সোন্দর চোখমুখ। কচি আম পাতার মত নধর শ্যাম। আইবুড় মেয়ে আমি, বুক কাঁপল, পরান চমকাল। ভয়ে নয়, সে যেন আর কিছু। আর পুরুষটিরও সেই দশা। অপলক চোখে কেবল দেখল কোন্ বাড়ীতে ঢুকি। তারপরেই বিয়ের সম্বন্ধ গেল রাজপুর থেকে। পুরুষ হল চক্রবর্তীদের ছোট ছেলে, আমার সোয়ামী। বাপ মোর পুজো-আচ্চা করে খেত, তাই নিয়ে কথা উঠল। কিন্তু চকোত্তিদের ছোটছেলের জেদের কাছে তা হার মানল। বিয়ে হল। তারপর ···

চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠল ভাত্রবউয়ের চোখের জল। বলল, বছরে এ দিনটাতে না এসে থাকতে পারি না। একবার তাকে দেখব বলে। সে দিনটি যে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

হাহাকার করে উঠল গোবিন্দের বুকের মধ্যে। বলল, বল ঠাকরুন, বলতে হইবে মোরে। কে তোমার এমন সব্বোনাশ করছিল।

বিদ্রূপে জ্বালায় চোখ জ্বলে উঠল ভাদ্রবউয়ের। কঠিন হেসে বলল, শুনি সে নাকি এখন ব্রহ্মজ্ঞানী হইছে, ধম্মো করছে। লোককে কালী-কেষ্ট দেখায়, শিষ্যি নিয়ে মঠ-মন্দির গড়ে। দলের পাণ্ডা ছিল সেই রাজ-পুরের আচায্যি।

আচায্যি? আচমকা পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও বোধ করি গোবিন্দ এতখানি বিস্ময়ে চমকে উঠত না। তারপরই এক সাংঘাতিক বোবা ক্রোধে তার সমস্ত শিরা-উপশিরায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আচায্যি! ধর্মগুরু আচায্যির এই সর্বনাশা কীর্তি। আর তার বাক্‌স্ফুরণ হল না, আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করল না। শান্ত সাধকের হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠল, নিস্‌পিস্ করে উঠল হাত। এখুনি কি সেই ধর্মের ষাঁড়টার মাংসলো গলাটা টিপে শেষ করে দেওয়া যায় না!

ভাদ্রবউ শঙ্কিত হল গোবিন্দর মুখ দেখে। ভাবল, না জানি কি সব্বনাশই করেছে সে গোবিন্দকে সব কথা বলে। কিন্তু গোবিন্দ আর কোন কথা না বলে বিদায় নিয়ে গ্রামের পথ ধরল। পেছন থেকে ভাদ্রবউয়ের গলা তার সঙ্গে এগিয়ে এল, অস্থির হয়ে কোন সব্বোনাশ ক'রো না বাবা। কেবল দেখো, আর কোন আবাগীর না মোর মত কপাল ভাঙে।

পূবের কোল থেকে চাঁদ খানিক উপরে এসেছে। শরৎপূর্ণিমা। ধোয়া আকাশ। নীল নয়, যেন কালো কুচকুচে। গাছপালা সব চক্‌চক্ করছে তবু ঝুপসি ঝাড়ে আঁধার যেন জমাট। আলোও গভীর, ছায়াও

গভীর। হেমন্তের গন্ধ পাওয়া যায় সামান্ত হাওয়ায়। এমনি সময় মনে হয়, এ আলো-ছায়া, শরতের ওই চাঁদ, এই বর্ণ—সবই যেন এক দুর্বোধ্য অজানা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি নিয়ে চেয়ে আছে।

বাড়ীর ফণীমনসার বেড়ার কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল গোবিন্দ। কে? শাড়ী পরা মেয়েমানুষ, মাথায় ঘোমটা নেই, অবিন্যস্ত বুকের আঁচল, যেন বুকের দিশা নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি মাত্র বঙ্কিম বিচিত্র আলোর রেখায় এক রহস্যময়ী যৌবনের ছবি আঁকা। ছায়ায় ঢাকা বাঁকা শরীরের অস্পষ্ট রেখা আরও তীব্র রহস্যঘন। গোবিন্দ দেখল বনলতা। কিন্তু একি চোখ, একি দৃষ্টি বনলতার! একি কান্না, ক্রোধ, নাকি আর কিছু? মুহূর্ত চোখ বুজল গোবিন্দ। সারা মুখে তার দরদর ধারে ঘাম বইছে, যেন জ্বরের ঘোরে কপালের শিরাগুলো স্ফীত। আহা, ভাদ্রবউয়ের সে মুখ তো ভোলা যায় না! ··· আবার চোখ খুলল। ঝুঁকে পড়ল বনলতার মুখের কাছে। কই, মনে তো হয় না, এ মেয়ে ধর্মবিরুদ্ধ, অর্বাচীন, অসতী!

গোবিন্দর ভাব দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে আসে বনলতার চোখ, উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে বুক। দু'হাতে গোবিন্দর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কি হইছে সাধু, কি হইছে তোমার?

না, আজ আর চোখ ঠারল না গোবিন্দ নিজেকে। কুণ্ঠায় ত্রাসে প্রাণ তার ধরিত্রীর অন্ধ-গর্ভ খুঁজল না। নাই-বা থাকল মহিম, এখুনি নাই বা পাওয়া গেল পাগলাবামুনকে। এ মেয়ের কাছেই আজ সে সব কথা বলবে। এ মেয়ে কি তার পর?

ঘরে পিসির লক্ষ্মীপূজো। লোকজনের সাড়া পাওয়া যায় বাড়ীর ভিতরে। বৃদ্ধ নসীরামও আজ মেতেছে। সেবাদাসী সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সে গান ধরেছে।

বনলতার সঙ্গে গোবিন্দ এল আখড়ার পিছনে ডাহুকের আস্তানায় ডোবার ধারে। সেখানে বসে উত্তেজনায় আবেগে সব কথা সে বলে গেল বনলতার কাছে। বলতে বলতে আবার বোবা ক্রোধে থমথমিয়ে উঠল গোবিন্দ। বলল, আচাষ্যিরে খুন করব মুই।

আশ্চর্য শান্ত আর মমতাময়ী হয়ে উঠেছে বনলতা। শঙ্কিত গলায় বলল, ছি, খুনের কথা বল না। আচাষ্যিরে ত্যাগ দেও তুমি। ওর ধম্মের ভোল ভেঙ্গে দেও।

কিন্তু আবার কান্নায় ভরে উঠল গোবিন্দর গলা। বলল, মায়ের কথা মোর মনে হইলে বুকটা ফেটে যায়রে লতা। সে পাপের বুঝি প্রাচিত্তি নাই।'

এর বাড়া প্রাচিত্তি আর কি হবে সাধু? বলে বনলতা হাত রাখল গোবিন্দর উষ্ণ কপালে।

সাধু নয়, মোরে গোবিন্দ বলে ডাক্ লতা।

ও নাম মোরে নিতে নাই।

সহসা যেন নতুন গলার স্বরে চমকাল গোবিন্দ। নিঃসীম আকাশে শরতের চাঁদ যেন কুহেলিকা। তার আলোয় বনলতার মুখ ও কুহেলিকা-পূর্ণ। ঠোঁটে হাসি ফুটল বিচিত্র, চোখে মোহিনীলীলা। তার উষ্ণ নিশ্বাস লাগল গোবিন্দর গলায় গালে। তার সারা শরীর কাঁপল। বুঝি চকিতে সেই কুণ্ঠাও এল। কেবলি মনে হল, এ মেয়ে কি তার পর? বলল, ছোটকালে তুই তো মোরে নাম ধরে ডাক্‌তিস?

ছোটকাল যে আর নাই। বলতে বলতে সেই দুরন্ত মেয়ে বনলতাও আজ গোবিন্দর চোখের উপর থিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

গোবিন্দ বলল, তবে কি আছে?

মোরা আছি।

সেই তেমনি ?

না। নতুন ধারা।

বনলতার পাতা হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে যেন বহুদূর থেকে বলল গোবিন্দ, জগতের তালটা ধরতে পারি না, মোরে খানিক তুলে ধর্ তো বনলতা।

বনলতা তার প্রজাপতির ঝাপ্‌টা খাওয়া খালি বুকটায় গোবিন্দর মাথাটা চেপে ধরল। গোবিন্দর এ আত্মসমর্পণে কান্নায় বুকটা ভরে উঠল তার। জড়ানো দু'হাতে তার সতেজ বনলতার মহীরুহ বেষ্টনীর উল্লাস।

এমনিভাবে বুঝি ধরিত্রীর গর্ভে নতুন ভ্রূণ সঞ্চারিত হয়।

ঝোঁপের ছায়ায় আখড়ার বেড়ায় হেলান দিয়ে বনলতার অন্তর্যামী নরহরি সে দৃশ্য দেখল। অন্তর্যামী বলেই বোধ হয় তারও মুখ হাসিজলে মাখামাখি। গলায় সুর কেঁপে উঠল তার। কিন্তু না, সখী বাধা পাবে গলার স্বরে। আখড়ায় ঢুকে সকলের আড়ালে একতারাটি নিয়ে সে তেপান্তরের পথ ধরে খালের মোহনার দিকে এগুল। বিরহ নয়, বুক উজাড় করে মিলনগাঁথাই গাইবে সে আজ।

কিন্তু ভাদ্রবউয়ের অনুরাগে ভরা এ রাত্রি যেন কি খেলা শুরু করেছে।

এমনি সময়ে মহিম উমার ঘরে, উমার পাশে অর্ধচেতন বিহ্বল মূক হয়ে বসে উমার উদ্বেলিত আবেগ উত্তেজনার কাকুতি শুনছে।

তেপান্তরের ধারের সেই জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে চাঁদের আলো

ঘরের মধ্যে। রাজপুরের ধূসর রেখা, দূর আকাশে হেমন্ত কুয়াশার পাতলা আভাষ। প্রাণবন্ত শারদরাত্রি, শরতের শ্রেষ্ঠ দিনটি। শিউলী-ফুলের মোহিনীগন্ধ যেন লেপ্টে রয়েছে সর্বত্র। দিন ভেবে পাখী ডাকে আলো ভরা বাসা থেকে। ভেসে আসে লক্ষ্মীপূজোর কাসর ঘণ্টার শব্দ। এ বাড়ীতেও আজ পূজো। নীচে চলেছে সে উৎসব, ঝি চাকরের হাতে সব ভার। খাটছে আমলা কামলারা। গৃহিণী লক্ষ্মী অভিসারে মত্ত।

উমা আজ সশস্ত্র। মারণাস্ত্র তার সর্বাঙ্গে, চোখে মুখে বেশে। সে অস্ত্র অদৃশ্যে অন্তর ঘায়েল করে। অজ পাড়াগাঁ নয়নপুরের শিল্পীকে ঘায়েল করার জন্য এই আয়োজন। কিন্তু কেন? শিল্পীর জীবনকে উন্নত মর্যাদাময় আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য? দেবতার জন্য ভক্তিমতীর একি আয়োজন! হ্যাঁ, বর প্রার্থনার কৌশলই বুঝি এই যে, দেবতার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করতে হবে।

ঘরের এক কোণে নিষ্কম্প স্তিমিত আলো। দরজা বন্ধ। সমস্ত মহল নিস্তব্ধ, কেবল যেন অনেক অদৃশ্য মানুষের পদশব্দের ধুপধাপ শব্দ শোনা যায়।

উমার সর্বাঙ্গে একটিও গহনা নেই, বাঁধা নেই চুল। সবই যেন অগোছাল। চোখে বহ্নি, প্রাণে বহ্নি, বহ্নিময়ী উমা। সেই বহ্নি ডাক দিয়েছে মহিমকে। উমা বলে চলেছে শিল্পীর জীবনের ভবিষ্যৎ, দুনিয়া জোড়া যার নাম, পথে পথে যার পরিচয়, ঐশ্বর্য, সুখ একটানা সুখের জীবন। গ্রাম নয়, শহর। নয়নপুর নয়, কলকাতা। বোধ করি এ মন্ত্রেরই পাশে পাশে যে কথাটি চাপা আছে তা মণ্ডলকউ অহল্যা নয়, শহরের ধনী বিদুষী উমা।

কিন্তু মহিমের অসহায় বুকে ত্রাস, অবিশ্বাস। বিদ্যুতের মত চমকে

চমকে উঠছে অহল্যার চোখ, নিষ্ঠুর বঙ্কিম ঠোঁট অথচ কান্নাভরা। কলকাতা পাগলা গৌরাঙ্গের কাছ থেকে চলে আসার দিন সেই চোখের জল, আলিঙ্গন। শৈশব থেকে যৌবন, এক বিচিত্র বন্ধন গড়ে উঠেছে। কি জানি, কি সে বন্ধন। তবু নাড়ির টান যেন! দুর্বোধ্য মন শুধু বলে, অহল্যা বউ যে! আর এই নয়নপুর, রাজপুর, খাল, মাঠ, সবার বড় তার মানুষ, হরেরামদা, অখিল, পীতাম্বর, ভজন, কুঁজো কানাই, অর্জুন পাল, গোবিন্দ, বনলতা, আখড়া—এমন কি তার দাদা ভরত, তার প্রাণকেন্দ্রের বেড়া। যেখান থেকে হাত বাড়ালে মাটী পাওয়া যায়।

সে বলল মাথা নীচু করে, না, নয়নপুর ত্যাগ দেওয়া মোর হইবে না।

সে কথায় বহ্নিশিখা আরও লেলিহান হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরে চাঁদের আলো নিয়ে দাঁড়াল উমা। বঙ্কিম ঠোঁঠে মর্মঘাতী হাসি, বিলোল কটাক্ষ করে এক হাতে মহিমের চিবুক তুলে ধরে বলল, ভয় পেয়েছ? কেন? তোমার জীবনটা বড় হোক, আমার এ চাওয়া কি ভুল?

না।

তবে?

মহিম তাকাল চোখ তুলে। বুকের মধ্যে ধ্বকধ্বকিয়ে উঠল তার। সামনে যেন তার আগুনের শিখা দুলছে। আর ছায়াতে আধো-আড়াল করা উমার সুগঠিত বুকের অতল রহস্যের ঢেউ উঁকি। হাত দিয়ে মহিমকে টেনে ধরে উমা বলল, আমি তোমার শিল্পের ভক্ত, নয় কি?

হ্যাঁ।

তুমি প্রতিষ্ঠা চাও না?

চাই।

আমাকে চাও না?

মহিম নীরব।

উমা বলল, আমার ভক্তি তুমি চাও না?

চাই।

তবে তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে কিছু করতে দেবে না?

দেব।

তবে চল কলকাতা।

মহিম নির্বাক। কিন্তু উমা শিল্পীর গুণটুকু ছেড়ে শিল্পীকেই গ্রাস করতে চায় যেন। একি প্রাণের লীলা যে, শিল্পীকেই টেনে নিতে চায় সে! বিদুষী, ধনী, জমিদারের পুত্রবধূ উমা, নিজেকে চেনে না। কিন্তু, অজপাড়াগাঁয়ের এ চাষী ছেলেকেই কি চেনে?

উমা বলল, জমিদারের মাইনে নিয়ে থাকতে চাও তুমি?

না।

তবে কিসের প্রত্যাশা তোমার এখানে? কি সুখের আশায়?

মহিম অসহায় নিরুত্তর। কোন সুখের প্রত্যাশাই তো তার নেই।

হঠাৎ উমা তীক্ষ্ণ গলায় ঢেউ দিয়ে বলল, তোমার বউদি দুঃখ পাবে, তাই?

মহিম বলল, নয়নপুর মুই পারি না ছাড়তে।

উমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বলে উঠল, নাঃ, ছোটলোক কখনো মানুষ হয় না। নিজেদের ভাল-মন্দও কি তোমরা বুঝতে পার না?

শুধু চমকাল না মহিম। বিস্মিত বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে জ্বলে গেল অপমানে, সিঁটিয়ে গেল ঘৃণায়। একটু চুপ থেকে বলল, আমি যাই তা হইলে?

আবার উমা পেখম খোলে। বলল, আমি তোমার বন্ধু, বোঝ না?

বুঝি।

তোমাকে ডেকে আনি জানলে আমার শ্বশুর রুষ্ট হবে, তবু ডাকি, জান তুমি ?

জানি।

তবে আমাকে কি খারাপ মানুষ ভাব ?

মহিম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছি, তা কি করে হয় ?

তবে ?

মোরে মাপ করেন।

না, সুন্দরের ভক্ত মহিম, উমার কাছে সে রুষ্ট হতে জানে না।

উমা বলল, বাইরে পরান আছে, দরজা খুলে যাও। তারপর আপন মনেই বলে উঠল, চাষার গোঁ, মাটী কাঁটা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুনল সে কথা মহিম।

উমা তাকিয়ে রইল মহিমের চলমান শরীরটার দিকে। নরম শ্যামল মিষ্টি শিল্পী। কিন্তু দেহের কোথায় যেন একটা কঠিন ভঙ্গি ফুটে রয়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে আচমকা ছুটে গিয়ে দু'হাতে সাপটে ধরল উমা মহিমকে। বলল, প্রণাম করলে না আজ ?

মহিম রুদ্ধশ্বাস, অগ্নিদগ্ধের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেই বাহুবেষ্টনীর মধ্যে। তাকালো। চোখে যেন দেখল, তাকে নিয়ত আড়াল করা অহল্যা বউয়ের মুখ। ঝুঁকে পড়ল সে পায়ে হাত দেওয়ার জন্য। বাধা দিয়ে উমাই দু'হাত আটকে রাখল তার বুকে। বলল, ডাকলে আসবে তো ?

আসব।

হাত ছেড়ে দিয়ে উমা ভাবল, এটা তার নিয়তি।

বিস্ময় আর অপমান শুধু নয়, এক দুর্বোধ্য বোবা জ্বালায় প্রাণটা পুড়তে লাগল মহিমের। কান দুটো এখনো জ্বলতে লাগল উমার

কথাগুলো মনে করে। একবার মনে হল, সবটাই প্রলাপ। উমার আবেগ, রাগ সবই। আবার মনে হল, না, তাকে অপমান অপদস্ত করাই জমিদারের ছেলের বউয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তার সমস্ত বুক, হাত যেন জ্বলে যাচ্ছে। আগুনের আলিঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কি যেন ঠেলে আসছে গলার কাছে, বুঝি কান্না পাচ্ছে। একি অভাবনীয় ব্যাপার। এমন অবাস্তব, এমন অসম্ভব সম্ভব হল কি করে যে উমার মত মেয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে চায়?

না, সে কথা বুঝবে না মহিম। যে উমা তাকে অমন করে চেয়েছে সে বিদুষী নয়, অভিজাত নয়, বুঝি জমিদারের পুত্রবধূও নয়। সে এক প্রেম-কাঙালি মেয়ে। কিন্তু তার ভয় বেশি, ক্ষুধা তার সর্বগ্রাসী, সংসারের প্রতি তার অবিশ্বাসই শিল্পীকে মুল থেকে উপড়ে টেনে তোলার উত্তেজনা জুগিয়েছে।

পরান গেট অবধি পৌছে দিয়ে গেল তাকে। মহিম টলতে টলতে ঘুরপথে বাড়ী ফিরে চলল।

কি রাত। উমার ঘর থেকে দেখা রাত্রির কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ল না মহিমের।

কিন্তু এ রাত যেন ভাত্রবউয়ের প্রাণের হাহাকার ভরা রাত্রি।

মহিম দেখল, একটা ঝোঁপঝাড়ের অন্ধকার ছায়ায় কি যেন নড়ছে। দেখল, হাত তুলিয়ে মাথা নাড়ছে কুঁজো কানাই। অদূরে কালুমালার মেয়ে উঠোনের নিকনো কুরচিতলায় বসে কাঁদছে এই লক্ষ্মীপূর্ণিমার ভরা রাত্রে। লুকিয়ে তাই দেখছে কুঁজো কানাই।

মহিম কোন কথা বলল না, ডাকল না কানাইকে। কেবল তার বুকের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও ভরে উঠল জ্বালায়। আরও দ্রুত মহিম পা চালাল ঘরের দিকে।

উঠোনে এসেই দেখল অহল্যা তার ঘরের দাওয়ায় এদিকে তাকিয়েই বসে আছে। মুহূর্ত স্তব্ধতা। যেমন করে কলকাতা পাগলা গৌরাঙ্গের ঘরে ছুটে গিয়েছিল মহিম অহল্যাকে দেখে, আজও তেমনি শিশুর মত ছুটে গিয়ে অহল্যার কোলের উপর দু-হাতে মুখ ঢেকে নীরব দুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

আশ্চর্য! অহল্যা চমকাল না, বিস্মিত হল না। যেন সবটাই তার জানা ছিল। দু-হাতে মহিমের পিঠে মাথায় গভীর স্নেহে বোলাতে লাগল সে, আর ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শক্ত করে রাখল নিজেকে। কেবল চোখ দুটোকে কিছুতেই স্বচ্ছ রাখতে পারল না।

এমনি কাটল কিছুক্ষণ। ... মহিম রক্তিম ভেজা চোখ তুলল, অহল্যার দিকে। মাথায় কাপড় নেই অহল্যার, কাঁধ খোলা। বিশাল বুক ঢাকা কাপড় বগলের পাশ দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছে। কপালে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সিঁদুরের টিপ। নির্নিমেষ চোখে জল। মহিমের গালে হাত বুলিয়ে বলল, মোরে কিছু বলতে হইবে না।

হ্যাঁ, বল্‌তে হইবে।

মহিমের গলার স্বর শুনে চম্‌কে তাকাল অহল্যা। বলল, কি বলবে?

মহিম বলল, শরীলটা জ্বলে যাচ্ছে।

অহল্যা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। হায়, একি সর্বনাশা চোখ হয়েছে মহিমের। শিশু নয়, কিশোর নয়, দুর্দম যুবক। চোখে তার আগুন। দুরদুর করে উঠল অহল্যার বুক, মুখটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। সে ডাকল তীব্র চাপা গলায়, ঠাকুরপো!

মহিম নির্বাক, আতুর।

অহল্যা ডাকল, মহী!

যেন ন'বছরের বউ পাঁচ বছরের দেবরকে শাসনের ডাক দিল।

মহিম বলল, কি ?

অহল্যা দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, মোরে কি গলায় দড়ি দিতে হইবে ?

চমকে পেছিয়ে এল মহিম।—কেন ?

নয় তো কি ?

কি যেন হৃদয়ঙ্গম করে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে মহিম তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অহল্যা ভেঙে পড়ল কান্নায়। বাঁধভাঙা পূর্ণিমার আলোর মত কান্নায় ডুবে গেল সে।

তারপরে অনেকক্ষণ বাদে উঠে সে ডাক দিল, ঠাকুরপো, খাবে না ?

ভেতর থেকে জবাব এল না। কান পেতে শুনল অহল্যা মহিমের ঘুমন্ত নিশ্বাস।

অহল্যা এল নিজের ঘরে। ভরত ঘুমোচ্ছে। কিন্তু অহল্যার চোখ যেন শ্বাপদের মত জ্বলছে অন্ধকার ঘরে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বিছানার কাছে এসে হঠাৎ ভরতের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে।

ভরতের ঘুম ভেঙে গেল। বলল, কি রে বউ ?

অহল্যা নীরব।

ভরত বলল, মহী আসে নাই জমিদার বাড়ী থে' ?

আসছে।

তবে কি মানিক ছোঁড়া ভাত খেতে আসে নাই ?

আসছিল।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে ভরত বলল,

কাল আদালত থে' আসবার সময় লবপুরের ধনাই ফকিরের মাদুলী একটা নিয়া আসব, সেথে তোর ছাওয়াল আসবে।

এবার অহল্যার অবুঝ কান্নায় বুক ভাসল ভরতের।

আহা, বাঁধা বীণার তারে বেসুর কি গভীর!

শুক্লপক্ষ কেটে গিয়ে কৃষ্ণপক্ষ এল। শীতের আমেজ-লাগা দিনের পরে রাত আসে আকাশ ভরা হেমন্তের হাল্‌কা কুয়াশা নিয়ে। সেই কুয়াশায় আকাশের তারা ঝাপ্‌সা। এখন আর চোরা হিম নয়, রীতিমত শিশিরে ভিজে ওঠে সব। যারা এ হিমকে ভয় পায়, বুড়োরা তাদের বলে, ভাদরের রোদ আর আশ্বিনের ওষ, খামকা লোকে দেয় কার্তিকের দোষ।.... মাঠে মাঠে আর সবুজের নামগন্ধ নেই, সবই সোনার বরণ হয়ে উঠেছে। ধানখেগো পাখীর দৌরাত্ম্য বাড়ে। পাকা ধানের গন্ধ ছড়ায় বাতাসে। ছোট বড় সকলের চোখেই স্বপ্ন, স্বপ্ন গরু মোষের ড্যাবা চোখে।

কামারের ঘরে হাপরটানের কামাই নেই। শুধু কাস্তে কুড়ুল তো নয়। এসময়ে জল উনো। ভরা ডোবা শুকোয়, পথঘাট সব খটখটে হয়ে ওঠে। বাজারে হাটে গরুর গাড়ী চলচে, গাড়ীর চাকাও তৈরি হয়।

খালের জলে জোয়ার-ভাটা খেলে, কিন্তু ভরা বর্ষার অথৈ জল নয়, নামতে শুরু করেছে। আর জলও কাচের মত টলটলে।

গতানুগতিক হেমন্ত নয়, নতুন হেমন্ত। আশার সঙ্গে নতুন প্রতীক্ষা। গ্রামে গ্রামে ঢোল পেটানো হয়েছে, বাড়তি খাজনা বন্ধের ও বেগার কাজের। তার সঙ্গে আর একটি কথাও ছিল যে, নজরানা বন্ধ। যে দেবে সে হিন্দু হলে গরু খায়। মুসলমান হলে শুয়োর খায়।

ভাগের কথায় সাব্যস্ত হয়েছে, বীজ লাঙলে খাটুনি ফসল ফলানো—এ দায় রইল চাষীর। তারপরে যে যার ভাগ নেও আপন আপন খাটুনি ঝাড়াই মাড়াই করে। লোক চাইলে মজুরি দিতে হবে তার। মোদ্দা কথা হল, না খাটি তো দাঁতছড়কুটি আর পাই খাটি তো পাই চাঁই। গতর বলে কথা।

মহাজন জোতদারে সলাপরামর্শ করে, আকাশ ভাঙে জমিদারের মাথায়। বেগার ছাড়া তো জমিদারীই অচল। নজরানা ছাড়া ঐশ্বর্য কোথায়!

হ্যাঁ, গ্রামে গ্রামে মহকুমায় জেলায় আলোড়ন পড়েছে খুব।

দিন যায় নয়, দিন আসে।

কিন্তু মহিম যেন ঝিমোয়। প্রাণ নিঃসাড়, গতি স্তব্ধ। হাসে না, কথা বলে না, মূর্তি গড়ে না। কি যেন হয়েছে, কি যেন ভাবে। সেদিন আর নেই। সব সময়েই লোকজন আসে, নানান্ কথা বলে, জিজ্ঞাসাবাদ করে, কি হয়েছে?

কি হয়েছে, তা কি মহিমই জানে! কোথায় যেন সব বিকল হয়ে গেছে।

অহল্যা সব বুঝতে পারে। তা ছাড়া বুঝবার আর কেউ নেই বোধ হয়। তাই সে সামনে সবসময়ই সপ্রতিভ, সরস। বুঝি বা একটু বেশিই। একেবারে বিলুপ্ত না হোক, ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে মহিমের মনের গত সব দুর্ঘটনার যন্ত্রণার বেদনার ছবিগুলো। কিন্তু আড়াল আবডাল থেকে দু-চোখ মেলে উদ্‌গ্রীব হয়ে মহিমকে দেখে সে। দেখতে দেখতে কখনো কান্নায় কখনো নিষ্ঠুর হাসিতে ঠোঁট বেঁকে ওঠে তার।

ভরত দেখে সবই, থাকে চুপচাপ। ভাবে ছোঁড়ার যেন আবার কি.

হয়েছে। মনে করে হয়তো বা বউদি-দেওরে কোন বিবাদ মান-অভিমান চলেছে। তবু অহল্যার নিরলস কাজ ও ফাঁকে ফাঁকে থম্‌কানো কান্না দেখে বুকটা তার ভারী হয়ে ওঠে। আবাগীর বুকটা খালি কি-না, অফলা গাছ। কিন্তু ঝাড় ফুঁক মাদুলী জলপড়া কোনটাই তো বাদ গেল না। এ গেল এদিকে, আসলে ভরতের প্রাণ পড়ে আছে আদালতে যেখানে তার জীবন-মরণের হদিস পড়ে আছে।

বনলতা ও গোবিন্দকে দেখে মহিম শুধু চমকায়নি, থম্‌ধরা ভাব তার গভীর হয়েছে। প্রিয়বন্ধু গোবিনের চোখে স্বপ্ন, নতুন আমেজে সজীব। তাকে দেখলে আজকাল আর উদাসী ধার্মিক বাউল বলে ঠিক মনে হয় না। তার গেরুয়াতে যেন কিসের রং লেগেছে। সে প্রায়ই মাঠে যায়, এতদিন যেন স্বপ্নের ঘোরে ফেলে রাখা ক্ষেত-জমির হদিস পড়েছে। রাজপুরের আচায্যির কথা বলেছে সে ঘরে ঘরে, উলটে আজ আচায্যির মুখোস খুলে তার সর্বনাশের পথ তৈরি করছে। সে বলেছে সবকথা মহিমকে, পাগলা বামুনকে। আচায্যিও পড়েছে খুব বেকায়দায়। সে নাকি বলতে শুরু করেছে এ পাপের দেশ ছেড়ে চলে যাবে বৃন্দাবন। ··· গোবিন্দ আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছে জোতদার-জমিদারের সঙ্গে বিবাদে।

কিন্তু মহিম চমকায় বনলতা ও গোবিন্দকে দেখে। ভাবে ওদের যেন কিছু একটা বোঝাপড়া হয়েছে।

বনলতার ঠোঁটে বিচিত্র হাসি সব সময় লেগেই আছে। মনে হয়, বিজয়িনী বনলতা। কিশোরীর চাঞ্চল্য কেটে গিয়ে যৌবনের ভারে ধাধসে চলে সে। অস্থির নয়, সুস্থির। ভরাট প্রাণের গভীরতা তার চলনে বলনে। মহিম দেখে, হাসিতে তার গভীর অর্থ। শুধু চমৎকার নয়, মহিমের চাপা-পড়া প্রাণে যেন ঘা লাগে আরও।

এই সময় একদিন হঠাৎ ভোরবেলা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল একটা কথা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে; মহকুমায়, জেলায়, হরেরামের হত্যার কথা!

হরেরামদা খুন হয়েছে। মহিমের পায়ের তলায় মাটী টাল খেয়ে উঠল। বিশ্বাস করা যায় না যেন। হরেমামদা খুন! কেন? কার, কাদের এতবড় শত্রু হরেরামদা! নয়নপুরের চাষী যোদ্ধা, নতুন দিনের সবার চেয়ে এগুনো মানুষটা। মহিমের মনে পড়ল সেই সভার কথা, হরেরামদা'র একহারা শক্ত শরীরটা তেজে প্রতিজ্ঞায় খাড়া, মুখ ভরা হাসি আর, কি কথা! সবার মুখে এক নাম, ছোট-বড় সবার মাঝিতে যে সারা তল্লাটে গণ্য হয়ে উঠেছে, সেই হরেরাম। চিরটাকালই মানুষটা পরের ক্ষেতের তরকারি বিক্রী করেছে হাটে বাজারে, পরের গাড়ী চালিয়েছে, পরের মাঠ চাষ করেছে নিজের পরিবারটিকে জিইয়ে রাখবার জন্য! নিজের কিছুই ছিল না। সেই মানুষের এখন শত্রু কে?

গত ক-দিনের সব কথা চাপা পড়ে গেল মহিমের মনের তলে। সে ছুটল হরেরামের বাড়ীর দিকে।

প্রথম হল্লাটা কাটিয়ে উঠে সারা নয়নপুর, রাজপুর তখন থম্‌থম্‌ করছে। চোখে চোখে চাপা আতঙ্ক, সন্দেহ, কান থেকে কানে কথা চলছে ফিসফিসিয়ে। যেন হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে সবাই। দু-চারজনের চোখ স্থির জলন্ত, কঠিন। যেন সেই গোপন হত্যাকারীকে চিনে ফেলেছে তারা।

গাঁয়ের মেয়েরা ঘিরে আছে হরেরামের বউকে। কিন্তু আশ্চর্য! হরেরামের বউ তো কাঁদছে না। একদৃষ্টে মাটীর দিকে তাকিয়ে দাওয়ায় বসে আছে। সন্তান শোষিত অবনমিত বুক খোলা, কাপড় ঢাকা পেট মস্ত উঁচু হয়ে আছে। পোয়াতি বউ। কোলের ছেলেটা,

বিস্মিত চোখে মেয়েদের দেখছে থেকে থেকে আর মুখের মধ্যে মুঠি পুরে দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে।

এর মধ্যেই দেখা গেল, কেউ কেউ প্রেতযোনির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। অসময়ে, রাতের কোন বিশেষ প্রহরের অন্ধকারে বেলতলা, শ্যাওড়াতলা, বাঁশঝাড়ে যে অশরীরি আত্মারা বাগ পেলে ঘাড় মটকে দিয়ে খায়, কে না জানে একথা। আর হরেরামকে পাওয়াও গেছে বাঁশঝাড়েই। কোথাও কাটাকুটির দাগও নাকি নেই। এখন কথা হল, কার পাপে, কার দোষে? বউয়ের পাপ সোয়ামীতে বর্তায়, সবই জানে। হয় তো ভরা পেট নিয়ে ওই মাগী কোন বেচাল করেছে। সাঁঝে দাঁড়িয়েছিল বা ছেঁচতলায়, নয়তো মাঠেঘাটের হাওয়া নিয়ে এসেছে বয়ে। তবে বেহ্মদত্যির পথে পড়লে দোষী-নির্দোষীর প্রশ্ন নেই?

একজন জিজ্ঞেস করল বউকে, পায়খানা ফিরতে বার হইছিল নাকি রাত্তে?

চোখ না তুলে ঘাড় নাড়ল বউ।

তবে?

স্থির ভাবলেশ হীন চোখ তুলে সবাইকে দেখে বউ আবার মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, চখে মোর আধ ঘুম, অনেক রাত তখন। কে যেন তাকে ডেকে নিয়ে গেল।

ডেকে নিয়ে গেল? সবাই কণ্টকিত হয়ে উঠল। মহিমও। যারা 'বেহ্মদত্যির' হদিস পেয়েছে তারা চোখ বড় বড় করে পরস্পরের সঙ্গে গভীর অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টি বিনিময় করে ঘাড় দোলাল। অর্থাৎ আর কোন সন্দেহ নেই। একজন জিজ্ঞেস করল, গলার স্বরটা চেনা মনে হইল?

এবার বউয়ের চোখ দারুণ অস্বস্তি ও যন্ত্রণায় থমথমিয়ে উঠল। বলল, চিনি। চিনি কিন্তুক মানুষটারে, চিনতে পারছি না।

মহিমের মনে হল এ দিশেহারা স্মৃতির জন্যই যন্ত্রণায় বউ কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেছে।

বাড়ীর পিছনে খানিক দূরে বাঁশঝাড়ের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল মহিম। মৃত হরেরামকে চোখে পড়তেই মহিমের মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটা যেন টিপে ধরেছে কেউ। ··· একি মরা মানুষের মুখ! এ তো মেরে ফেলা মানুষের মুখ। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি হারেরামের মুখে। ভ্রূকুটি গোল চোখ, স্থির, নির্নিমেষ চোখের মণি। যেন হঠাৎ রাগে কটমট করে তাকিয়ে আছে। মুখ খানিক হা করা। চিৎ করে ফেলেচে বলেই বোধ হয় জিভটা বাইরে এলিয়ে পড়েনি। তামাকের ধোঁয়ায় হলদে ছোঁপ লাগা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। চোখের কোণে পিটুলিতে লাল রং গোলার মত খানিক রক্ত।

মহিম যেন দিব্যচোখে দেখতে পেল, ব্রহ্মদত্যির মত ষণ্ডা মানুষ হরেরামদার গলাটা টিপে ধরেছে। টিপছে আরও জোর টিপছে, প্রাণপন টিপছে। তাই হরেরামদার গলাটাও যেন খানিক লম্বা হয়ে গেছে।

না,—কিছুতেই যেন তাকানো যায় না ও মুখের দিকে। একবার তাকালে ত্রাসে প্রাণ ভরে যায়। আবার তাকালে বুকে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তারপর সমস্ত বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে। নিরীহ, ঠিকে জমির উপর ভিটে যার, পরের কাজ-করে-খাওয়া মানুষ হরেরামদা'র এমুখ যেন মরা মুখ নয়, মনে হয় শত্রুর আক্রোশ নিষ্ঠুরতাই সমস্ত মুখটায় ভরা। বীভৎস, কুৎসিত।

এ মুখ যে ভোলা যায় না।

সামনে মানিককে দেখে মহিম বলল, তোর মণ্ডল কাকী কোথা? অর্থাৎ অহল্যা।

মানিক বলল, হরেরাম কাকার বউয়ের ঠাঁই গেল।

মহিম বলল আস্তে আস্তে, মোর ঘরে যা তো। পশ্চিম বেড়ার তক্তায় বড় হাঁড়িতে কাপড় জড়ান ঠোঙা আছে একটা। শুঁকে দেখিস রগারের গন্ধ। নিয়ে আয় গে। দেখিস্, ওজন আছে মালটার।

মানিক বলল চোখ বড় বড় করে, তোমার সেই মূর্তি গড়ার মশলা?

হ্যাঁ। যা ঝট্ করে। মহিম আবার ফিরল হরেরামের দিকে। না, এ হরেরামদা'র মুখ নয়, মরা মানুষের মুখ নয়। সে ভিড় করা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। কই, মরা মানুষের মুখ দেখে তো কারুর চোখ মুখের ভাব এমনটি হয় না। এ মুখ এক নারকীয় ঘটনার ছবি, সারা মুখটায় এক ষড়যন্ত্রের পরিণতি যেন থম্ থম্ করছে। ...কে একজন বলে উঠল, মোর ঠাকুরদারেও মেরে ফেলেছিল ওরা। তবে বড় বাঁশঝাড়ে নয়, ডেকে নিয়ে কাছারি ঘরে বাঁশডলা দিয়ে।

এখানকার ভিড় করা মানুষগুলোর জোড়া-জোড়া চোখগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল শিল্পীর চোখ। সে ভুলল এ ভিড়্। এখানকার ফিসফিসনো আর গেল না তার কানে। তার সারা মুখে নতুন জ্যোতি।

ভজন এসে ধরল মহিমের দুই হাত।—কি ভাবছ মহী?

মহিম বলল, ভাবাছ ওই মুখের কথা।

ভজন দু-হাতে আলিঙ্গনের মত মহিমের কাঁধ ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, ওরা বুঝি ভাব্ছে, হরেরামেরে মেরে ফেলে মোদের চুপ মারিয়ে দেবে। কিন্তক্ আগুন ওরা জালল ভাল হাতে। হরেরামের মন্তর মোরা ভুলব না। একটু থেমে তারপর বলল, ক-দিন আগে যখন জমিদার কাছারিতে ডেকে নিয়ে হরেরামরে শাসায়ে দিল তখনই মুই বুঝছি বেগতিক কিছু হইবে। কিন্তক্ সে যে এতবড় সর্বোনাশ—

বন্ধ হয়ে গেল ভজনের গলার স্বর।

মহিমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এল। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল হরেরামের মুখের দিকে।

ভজন বলল, মানিকরে কনঠাঁই পাঠালে?

ঘরে, প্লাস্টার আন্‌তে।

পেলোস্টারটা কি?

মূর্তি গড়ার মশলা।

হরেরামের ওই মূর্তি গড়বে তুমি? শুধু আনন্দে নয়, বিস্ময়ে জলে উঠল ভজনের চোখ।

মহিম বলল, এ তো মুখ নয় ভজনদাদা, শত্তুরের সব্বোনাশা কীত্তি। চাষী মনিষ রে চেরকাল মুই এ মূর্তি দেখিয়ে বেড়াব।

মহিমকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ভজন হাসি-কান্নায় ভরা এক বিচিত্র শব্দ করে উঠল। সকলেই ভিড় করে এল তাদের দুজনকে ঘিরে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ে ঘরে।

মানিকও এল মাটী নিয়ে। মহিম দেখল পুরুষের ভিড়ের পেছনে দুটি চোখ একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছে, কপালে তার কাচ-পোকার টিপ্, মাথার ঘোমটা সরানো। সে চোখে কি ছিল না জানলেও মহিমের সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ল সেই অচেনা ভাব। ও মুখ অহল্যার। গত দুর্ঘটনার এতদিন পর মহিম প্রথম হাসল, ছায়া সরল তার মুখ থেকে। একবার ভাবল সে যাবে অহল্যার কাছে। কিন্তু লজ্জা করল মনে মনে। সে কাজ আরম্ভ করল।

ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস লাগতে মহিম তাকিয়ে দেখল, গোবিন্দ। অনুরাগে ভরা দুই চোখে বন্ধুর অন্তস্থলকে স্পর্শ করার বাসনা। মহিম হাসল।

ইতিমধ্যে খবর এল নয়নপুরে পুলিশ এসেছে সদর থেকে। পুলিশ পাগলা বামুনদের বাড়ীতে ঢুকে তল্লাসী করেছে! তার নামে নাকি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে। কিন্তু পাগলাঠাকুর যেন হাওয়ায় গায়েব হয়ে গেছে নয়নপুর থেকে। তারপর পুলিশ এখন গেছে জমিদার বাড়ীতে, অক্ষয় জোতদার গেছে সঙ্গে সঙ্গে। খানিক বিশ্রাম করে পুলিশ আসবে এখানে। খবরটা নিয়ে এল নয়নপুরের হাবু চৌকিদার।

হাবুকে ঘিরে ধরল সবাই খবরের জন্য। পাগলাঠাকুর কি অপরাধ করল?

হাবু চৌকিদার বলল, কে জানে। শুনি এলাম, ঠাকুর নাকি সরকার বাহাদুরের শত্তুর। লোক খ্যাপায় সে।'

আর হরেরামের খুনের ব্যাপারটা?

হাবু বলল, সেই পরামশ্য তো করতে গেল বড় দারোগাবাবু জমিদারের কাছে। তারপর সে মহিমের কাছে গিয়ে আস্তে বলল, এইটুক তাড়াতাড়ি কাম সারো মণ্ডলের পো, নইলে দারোগা এসে পড়লে ফ্যাসাদ লাগবে।

মহিমের হাতের বাটুতে তখন মৃত হরেরামের বীভৎস মুখ প্লাস্টারের মলাটাতে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

(২০)

কয়েকদিন পর।

হরেরামের মৃতদেহ পুলিশ সদরে নিয়ে গেল, আবার ফিরিয়ে দিল। রায় দিল, হরেরাম আত্মহত্যা করেছে।

মরা ছেলে বিয়োল হরেরামের বউ। আর মানুষ দেখলে কেবলি চোখ বড় বড় করে বলে, চিনি চিনি। মনে করি আগে তা'পরে বলব সবারে। বলে আর হাসে, কাঁদে।

অস্পষ্ট স্মৃতির জ্বালায় বউ আজ বাউরী হয়েছে হরেরামের। বাউরী বউয়ের শোক নিয়ে নয়নপুরের বাতাস হয়েছে বাউরী। শুধু নয়নপুরের নয়, ক'টা মহকুমা জুড়ে। অসময়ে ধর্মঘটের পূজো দিল চাষীরা। পণ রাখল মরণের, কাস্তে কুড়ুল হাতুড়ি বাটালি সব ছাড়ল চাষী কামাররা। বছরের সুদিন এলে বৈশাখে আবার দেবে তারা ধর্মঘটের পূজো। কিন্তু যে যমের দ্বারে হরেরামকে গলা টিপে ঠেলে দিয়ে এল শত্রুরা, তাদের সঙ্গে রফা নেই।

দিন যায়। ধান ঝরে মাঠে, পায়রার ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পালা পড়েছে তাদের। দেশ যেন অরাজক, শস্য বুঝি মূল্যহীন। কারুর কারুর মনে খটকা লাগল, এ তো ঠিক হচ্ছে না। নিজের ভাগেরটা কেন ছাড়ি? লাগ্ লাগ্ করে আবার বৈঠক হয়। সবাই মিলে সাব্যস্ত করে: হাঁ নিজের পাওনা ঘরে তোল।

এমন সময়ে রফার কথা এল জমিদারের। বেগার নজরানা ছুটোই খুশির ব্যাপার। না দিলে কথা নেই, দিলে বাপ ছেলের মধুর সম্পর্ক

বজায় থাকবে। জবরদস্তি রইল না। খাটনির দাম দেওয়া হবে। পড়তি খাজনা মকুব করা গেল। এ ঘোষণায় সবাই নিরস্ত হল বটে, কিন্তু বুঝল, শত্রু তাদের সবার বড় সর্বনাশ সমাধা করেছে হরেরামকে মেরে। আজ হোক, কাল হোক, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। আবার জ্বলবে আগুন।

আগুন জ্বালা রইল মহিমের ঘরে। সবাই আসে হরেরামের সেই মুখ দেখতে। সত্য, এ তো মুখ নয়, শত্তুরের পৈশাচিক কীর্তি। এ মুখ কেউ ভুলল না।

অনেকগুলি মাস কেটে গেছে।

এতদিনে মহিম অনেক গড়েছে। যা তার ইচ্ছে হয়েছে তাই গড়েছে। কখনো দিগন্তে পাড়ি জমানো ডানা মেলে দেওয়া পাখী, শাবক হারানো উৎকণ্ঠিত দিশেহারা গাভী। গাঁয়েঘরের সবাইকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে তার সূক্ষ্ম কাজ সোনার বরণ ধানের গোছা। সেই ধানের গোছা উপহার দিয়েছে সে তার বাল্যসখী বনলতাকে। ··· আর কাজ করতে করতে হরেরামের বউয়ের কান্না আড়ষ্ট করে দিয়েছে তার হাত, প্রাণ থম্‌কে থেকেছে। তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে নিরালায় ছুটে গেছে সে। এ কান্না তার সয় না। কিন্তু গতবছরের কোজাগরী পূর্ণিমা দিন থেকে তার জীবনে যা ঘটে গেছে তার ছায়া যে আজও তার মুখে এক বিচিত্র ছাপ রেখে গেছে। আগের চেয়ে অহল্যার কাছ থেকে সে দূরে সরে গেছে কিছুটা। কিন্তু উভয়ের কি যে বিচিত্র বন্ধন, যখনই মহিমের মনে হয় অকারণে প্রাণটা বড় বেশি ভারী হয়ে উঠেছে, অযথাই কেন যেন বুকের মধ্যে কান্না গুমরে ওঠে তখনই, সে ছুটে আসে অহল্যার কাছে। অহল্যা সেজন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। দুজনে পাশাপাশি বসে অনেক কথা অনেকক্ষণ ধরে বলতে থাকে। নয়নপুরের কথা, তার মানুষের কথা, গোবিন্দ-বনলতার কথা, হরেরাম, তার পাগল বউয়ের কথা, সর্বোপরি মহিমের নিজের মনের বিচিত্র শিল্পী স্বপ্নের সাধনার কথা।

বলে না শুধু নিজেদের দুজনের কথা, উমার কথা। তবু মহিম মাঝে মাঝে অহল্যাকে ধরে বসে শৈশবের গল্প বলার জন্য। খেলা, ঠাকুর গড়া

আর অহল্যার সঙ্গে খুনসুটি করার গল্প। তার বাবা দশরথ মণ্ডলের কথাও জিজ্ঞেস করে সে

অহল্যা সব কথাই বলে। বলে আর আড়ালে কিছুতেই কান্না সে রোধ করতে পারে না। এ জীবনে বুঝি এ লুকানো কান্নার শেষ নেই।

গোবিন্দের কাছে মহিম আজকাল খুব কমই যায়। আজকাল তার বন্ধু হয়েছে নরহরি বৈরাগী। নরহরি আজকাল অবসর সময়ে খালের মোহনার ধারে বসে থাকে। মহিমও যায়। একজন গান গায়, আর একজন শোনে। দমকা হাওয়ার মত কথনো কথনো কুঁজো কানাইও আসে।

ইতিপূর্ব্বে আমলা দীনেশ সান্যাল কয়েকদিন এসে গেছে মহিমের কাছে জমিদারের চাকরির প্রস্তাব নিয়ে। মহিম একদিন গিয়েছিল এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এসেছে, এ প্রস্তাব তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। জমিদার হেমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কটু কথা বলেছেন, এমন কি ছদ্মকণ্ঠে শাসিয়েছেন। কিন্তু মহিম অটল। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এতখানি সম্মানের লোভ সে কেমন করে ছেড়ে দিল।

জমিদার জননেতা বলে গান্ধীজীর একখানি আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু মহিম তাতেও নারাজ হয়েছে। তিনি হরেরামের মূর্ত্তিটা চেয়েছিলেন, মহিম তাতেও অস্বীকৃত হয়েছে।

এর পরে মহিম ও উমা অদেখার মধ্যে থাকলেও বুঝেছিল, এক-জনের ডাকা, আর একজনের যাওয়ার সেই পালা খেলাও শেষ হয়েছে। সেদিনও এল। বলল, সাধে কি আর তোদের গাল দিই। হরেরাম

চাষার মুণ্ডু আর অধলের মোষ গড়ে ফষ্টি নষ্টি করছিস্, সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছিস্। এখুনি তু বলে ডাক দিলে গণ্ডা কয়েক আর্টিস্ট কলকাতা থেকে ছুটে আস্‌বে। আঁটি বাধা ছেড়েছিস্ যখন, লেগে পড়্।

মহিম সেই একই কথার জবাব দিল, জমিদারের ঠাঁই মুই যাব না।

দীনেশ সান্যাল হেসে চোখ কুচকে বলল, তবে বুঝি বৌঠাকুরানীর কাছে কলকাতায় যাবি?

হঠাৎ এতদিন বাদে সান্যালের মুখে একথা শুনে চমকে উঠল মহিম। সান্যাল বলল কুৎসিত মুখভঙ্গি করে, তুই ব্যাটা বেশ খেলোয়াড় আছিস্। এ্যাকেবারে বউ-শ্বশুরে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছিস। সেইজন্যই তো কর্তার অত জেদ তোকে নেবার জন্য।

কথাটা বলে ফেলে সান্যাল অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবল, বোধ হয়, আনাড়ির মত কথাটা বলে ফেলেছে সে। পরমুহূর্তেই মহিমের কাছে এগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তা বেশ তো, ওই দুজনার কাছ থেকেই দোঁরেমুষে কিছু কামিয়ে নে না।

কিন্তু আচমকা অন্ধকারে সাপের ফোঁস করে ওঠার মত রান্নাঘরের দরজায় এসে অহল্যা বলে উঠল, মোরা কাউকে দোঁরেমুষে কামাতেও চাই-না আর কত্তারে বলে দিও বাবু, তাদের বউ-শ্বশুরের টানা পোড়েনের মধ্যে মোরা যাব না।

সান্যাল একমুহূর্ত চুপ করে বলল, কে, ভরতের বউ না? তা বেশ বলেছ, মণ্ডলবউ। ওসব হেফাজতের দরকার কি গরীব মানুষের। ওরে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করাটা—

অহল্যা বলল, বিবাদ চাই না, সুবাদও চাই না। যেমন আছি তেমনি থাকব।

সান্যাল চোখ কুঁচকে চিবিয়ে বলল, তা কি থাকতে পারবে। মামলার

যে ভরত কাত, মারতে বসেছে। তার মধ্যে তোমার দেওর আবার আর্টিস্ট হয়েছে। বলে হো হো করে হেসে উঠল। যেতে যেতে ফিরে আবার মহিমের কাছে এসে বলল, তা তোকে একটা বলি। আমার ছেলেটাকে তোর কারিগরি একটু শিখিয়ে দে না, ওকেই না হয় লাগিয়ে দিই? জবাবের প্রত্যাশায় আগ্রহে সান্যালের কপালের রেখাগুলো সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠল।

একমুহূর্ত নীরব থেকে মহিম বলল, ছেলে আপনার শেষটায় আমের আঁটির ভেঁপু ফুঁকে বেড়াচ্ছে, দরকার কি সানেল মশাই?

সান্যাল খোঁচা খাওয়া জানোয়ারের মত দু-পা পেছিয়ে এসে একটা তীব্র ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করে লাঠি ঠুকে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর সন্ধ্যাবেলা ভরত এল সদর থেকে অসহ্য মাথা ধরা আর তীব্র জ্বর নিয়ে। দু-হাতে অহল্যার কাঁধে ভর দিয়ে বলল, তিন মাসের মেয়াদ দিয়েছে রে বড়বউ, দেনা শোধ না হলে ভিটেমাটী সবই যাবে। কিন্তু ভাবি অধম্মের একি যাদু যে, মুই হইলাম দেনদার জমিদারের কাছে!

এতবড় শোক সামলাতে না পেরে ভরত বিছানা নিল। অহল্যা স্বামীর বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল দিনের পর দিন। ভরতের বুকে মাথা রেখে বুকের কান্না চাপে সে। যত অবস্থা খারাপ হয় ভরতের ততই চাপা কান্না বাড়ে অহল্যার। এক বিচিত্র অনুশোচনা বাসা বেঁধেছে তার মনে যে, এ মানুষটিকে সে তার সব পাওনা বুঝি মেটায়নি। বুক তার তীব্র দহনে জ্বলে গেল। হায়, ভরত কেন তার সবটুকু আদায় করে নিল না। কিন্তু নিতে চাইলেই কি ভরতের তা মিলত? তেমন

করে তো অহল্যার কোন দিন মনেও পড়েনি। গর্ভে বসে যাওয়া চোখে যেন সব আশা নির্বাপিত হতে বসেছে তার। যে আশায় বুক বেঁধে মাদুলি জলপড়া ঝাড়ফুঁক সবই করেছে, যে আশায় নিরালায় বিবস্ত্রা হয়ে মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখেছে, সে ক্ষীণ আশা আজ নিঃশেষ হতে বসেছে বুঝি। আর কেবলি মনে হয়, ভরতকে সবটুকু দিলে বুঝি তার সে আশা পূর্ণ হত বা।

কিন্তু এর চেয়েও প্রচণ্ড বৈচিত্র্য ও বিপর্যয় লুকিয়ে ছিল তার মনের মধ্যে। তার প্রকাশ পেল, যখন সে দেখল উঠোনে গত বছরের মত পরানকে এসে দাঁড়াতে উমার ডাক নিয়ে। আবার বৌঠাকুরানী! চোখ ধক্ ধক্ করে জলে উঠল অহল্যার। সব ভুলে নিমেষে ভরতের বুক ছেড়ে উঠে এল সে। রোগা মুখ তার জ্বরো তাপে যেন তমৃতমে, তীব্র নিষ্ঠুর হাসিতে ঠোঁট বেঁকে উঠেছে।

পরান সে মুখ দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

মহিম বলল, আজ মুই যেতে পারব না পরানদা।

তীব্র গলায় অহল্যা বলল, কোন দিনই যেতে পারবে না।

জবাব নিয়ে পরান চলে গেল। তেমনি ব্যঙ্গ নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে অহল্যা সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

মহিম তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, কি হইছে তোমার বউদি?

কিছু না।

তুমি কি মোরে অবিশ্বাস কর?

অবিশ্বাস! চমকে উঠল অহল্যা, শান্ত হয়ে এল তার মুখ, আগুন নিভল চোখের। গলা বন্ধ হয়ে এল কান্নায়। কান্নার তুফান বুঝি। কেবল বার বার মাথা নাড়ল, না না না…! ছুটে গেল সে ভরতের কাছে, ভরতের বুকে।

ভরত একটু বোধ হয় ভাল ছিল। বলল, কাঁদবার ঢের সময় পাবি বড়বউ, এখন থাক। তোকে একটা কথা বলব আজ।

কথা! ভয় হল অহল্যার। কি কথা বলবে ভরত! ভরত বলল, মরেও মোর শান্তি নেই তোর জন্য। তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না। .... ছাখ, সদরের ডাক্তার একবার বলছিল, বাজা শুধু মেয়ে-মানুষ হয় না, পুরুষেও হয়। বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে ভরত। একটু চুপ থাকে। অহল্যার বুক কাঁপে। তার হাত একটা নিজের হাতে নিয়ে বলল ভরত, মুইও বাজা হতে পারি। মুই মরলে তুই আবার বিয়া বসিস্। বুকে তোর ছাওয়াল আসতেও বা পারে।

অহল্যার মুখটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। ভরতের বুকের কাছে মুখ গুঁজে বার বার বলতে লাগল সে, একি বলছ তুমি, একি বলছ! গো!

ভরত বলল, জানতাম বললে তুই কাঁদবি। ভেবে দেখিস্। তারপর বলল, মহী কুন্ঠাই?

মহীম এসব শুনে বেড়ায় মুখ চেপে কান্না রোধ করছিল। তাড়াতাড়ি এল ভরতের কাছে। ভরত বলল, তুই মোরে শনি বলছিলি, মুই তোরে মার দিছিলাম না রে?

মহিম তাড়াতাড়ি উদ্গত কান্না চেপে বলল, এসব কি বলছ দাদা?

ভরতের মৃত্যুন্মুখ স্বচ্ছ মুখ উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। বলল, কিন্তুক্ কুনঠাই মাথা গুজ্‌বি তোরা? বাঁচবি কেমন করে?

এই ভরতের শেষ কথা। সেই রাত্রেই মারা গেল সে।

ভরতের মৃত্যু মহিমকে নির্বাক করে দিয়ে গেল।

ভরতের মৃত্যুর পর অহল্যা এত দূরে সরে গেল যে, মহিম প্রায় অষ্টপ্রহরই নরহরির সঙ্গে খালের মোহনার ধারে গিয়ে বসে থাকত, আগে মহিম ঠাঁই নিয়েছিল এখানে অনেক দুঃখে। শুধু ঘর নয়, নয়নপুরের মধ্যে কোথাও শান্তির লেশ পেত না সে। হরেরামের বাউরী বউ যেদিন থেকে পথে পথে হেসে কেঁদে বেড়াতে শুরু করল, সেদিন থেকে সে প্রকৃতপক্ষে গাঁয়ের পথ চলাই বন্ধ করে দিয়েছিল। গোবিন্দ জীবনের নিশানা পেয়েছে, প্রাণখুলে সে কথা সে বন্ধু মহিমকে বলেছে। বলেছে, ভাদ্রবউয়ের কথা, তার সর্বনাশের কথা। আচায্যির কথা। আগেও বলেছে। বলেছে, তবে মোর জীবনে গুরুদেব রইল অক্ষয় হইয়ে, সে গুরু মোর পাগলা ঠাকুর। তার মন্তরই মোর মন্তর। সে হইল, পাপ কুচাল থেকে এই দেশোদ্ধার। .... আর বনলতা তার রহস্যময়ী হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছে বিচিত্র হেসে তার বাল্যসখার কাছে, মাতাল চোখে নিজেকে দেখিয়ে বলেছে, নতুন মানুষ আসছে তার মধ্যে, গোবিন্দর আর বনলতার জীবন সৃষ্টি। তাদের নতুন ঘর। মহিমকে ঠাট্টা করে বলেছে, বউবিবাদীর দাবিদার তুমি একজন, নিত্যপ্রহর ঝগড়া বাধাবার নিমন্ত্রণ রইল তোমার।

খুশিতে প্রাণ ভরে উঠেছে মহিমের কিন্তু হাহাকারের চাপা ধ্বনিও কেন যেন উঠেছে বুকের একপাশ থেকে। তবু সব মিলিয়ে সে যখন

সুর বাঁধবার চেষ্টা করছে তখনই কুঁজো কানাইয়ের অপঘাত মৃত্যু প্রাণটাকে টুণ্ডা করে দিল তার। গত কয়েকদিন যে ঝড় বৃষ্টি গিয়েছে, সেই ঝড়বৃষ্টিতেই কালুমালার মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর ঘরের পেছনে গাছচাপা পড়ে মরেছে কুঁজো কানাই। সবাই বলল, ওর তো স্থানকালের বিচার ছিল না, নইলে ঝড়ের রাত্রে কে বা বন জঙ্গল ঢুরে মরতে যায়! সত্য কথা। কিন্তু মহিম বুঝল ঝড়ের রাত্রে কুঁজো কানাইয়ের প্রাণে ডাহুকের অসহ্য বিরহ বাসা বেঁধেছিল। কাল মালার সোন্দরী মেইয়েকে ছিঁটে বেড়ার ফাঁক দিয়ে একবার দেখার আকাঙ্ক্ষায় আতুর করে তুলেছিল ওই ঝড়ের রাত্রিই।

জীবন্তে হল না, মরণের পর মহিম তার শিল্পসাধনার শরিক কুঁজো কানাইয়ের মূর্তি গড়া শুরু করল। কানাই মহিমের হাতে গড়া মূর্তি দেখে বলত, আচ্ছা, কোনরকমে যদি পরানের ধুকধুকিটা ঠেসে দেওয়া যেত মুত্তির বুকটাতে, তবে তুমি হইতে বেহ্মা।... আজ মহিমের মনে হল, কোথায় পাওয়া যাবে সেই প্রাণের ধুকধুকি, যা দিয়ে কানাইদা'কে জীবন্ত করে তোলা যায়।.... ধুকধুকি নয়, কানাইয়ের প্রতিটি অঙ্গকে জীবন্ত করে তোলার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করল সে। আর বার বার মনে পড়ল কুঁজো কানাইয়ের সেই কথা, কুরচিতলায় পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে কালুমালার সোন্দরী মেইয়ে, সে মূর্ত্তি কি গড়া যায় না?

কিন্তু প্রাণে তার থম্‌কে রইল কান্না। অহল্যা তো এল না তার মূর্তি গড়া দেখতে। জিজ্ঞেস করল না কোন কথা, দূর থেকে একবার চোখ তুলে দেখল না। চকিত হাসির সেই অভিনন্দন, মাথায় হাত দিয়ে কাছে টেনে সেই স্নেহ আদর কোথায়!

এমনি সময় একদিন পরানকে সঙ্গে নিয়ে উমা এসে দাঁড়াল মহিমদের

উঠোনে। এসে চমকে উঠল উমা। বাড়ীটা যেন পোড়ো বাড়ীর মত নিস্তব্ধ খা খা করছে। মনে হয়, কেউ নেই। মণ্ডলবউ অহল্যার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ঘরগুলির দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। কাকপক্ষী অবাধে ঘরে বাইরে ঠোঁট ঠুকে বেড়াচ্ছে।

নিঃসাড়ে মহিম বেরিয়ে এল। বিস্ময় নেই, দুঃখ নেই, আনন্দও নেই এমন একটি মুখ নিয়ে এসে দাঁড়াল সে। উমা দেখল, শিল্পী তার রোগা হয়ে গেছে, মাথার চুল বড় বেশি ঝুলে পড়েছে ঘাড়ের দিকে, চোখের কোল বসা। তবু সেই স্বপ্নময় চোখ, হাতে পায়ে মাটী মাখা, মুখে চুলেও মাটী।

উমা দ্রুত দাওয়ায় উঠে এল মহিমের কাছে। উৎকণ্ঠা তার মুখে। বলল, কি হয়েছে তোমার?

মহিম হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিছু হয় নাই তো। ঘরে আসেন।

উমা ঘরে এসে দেখল অর্ধসমাপ্ত এক কুঁজো মানুষের মূর্তি। প্রাণ চমকাল তার সেই মূর্তির চোখ দুটো দেখে। সে যেদিকে ফেরে সেদিকেই যেন কুঁজোর ঠেলে ওঠা বিহ্বল মুগ্ধ চোখ দুটো ওকে অনুসরণ করছে। কি দেখছে কুঁজো মূর্তি? কি রকম যন্ত্রণা হতে লাগল উমার বুকে সেই আকুল মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে। কিন্তু সে যেদিকে ফেরে সেদিকেই এ ঘরের মূর্তিগুলো আজ যেন বিচিত্র কটাক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল। একি হল তার। সে তাড়াতাড়ি ফিরল মহিমের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য! তার শিল্পী যেন আজ এ ঘরের মূর্তিগুলোর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশে গেছে। সে দ্রুত কাছে এসে মহিমের হাত ধরে বলল, কি দেখছ তুমি?

উমা দেখল মহিম যেন কেমন হয়ে গেছে। তার জীবনে যেন কোন বোঝা চেপে বসেছে যার ভারে মরতে বসেছে তার শিল্পী। সে বলল

বল, এখনও কি তুমি যেতে চাও না। লাঞ্ছনা কি আরও পেতে চাও?

মহিম যেন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল উমার দিকে। উমা বলল, তোমাদের ভিটেবাড়ীর কথা সব শুনেছি আমি পরানের মুখে। আমি টাকা দেব, আদালতে জমা দিয়ে তুমি সব মুক্ত কর। মণ্ডলবউকে সব দিয়ে তুমি চল কলকাতায়। তোমার যে অনেক বড় জীবন পড়ে রয়েছে সেখানে। এ মুহূর্তের জন্য মনে হল উমার গলায় প্রকৃত সরলতা ও আবেগ ফুটে উঠেছে।

মহিম নির্বাক। তার মনের মধ্যে আলোড়িত হয়ে উঠল জীবনের সব বিপর্যয়। হঠাৎ তার মনে হল, সবই যেন শেষ হয়ে গেছে, নয়নপুর যেন ছেড়ে দিয়েছে তাকে। গোবিন্দ-বনলতা নতুন জীবনে ফিরে গেল, হরেরাম ভরত কুঁজো কানাই মরে গেল। পাগল ঠাকুরের সঙ্গে দিনেকের তরে দেখা হব না কিন্তু তার দেশত্যাগ যেন মহিমের বুকটাও খালি করে দিয়েছে। হরেরামের বউরী বউ পথে পথে ঘোরে, নয়নপুরের বাতাস ও বাউরী হয়েছে। নরহরির গানে শুধু কান্না। সর্বোপরি, অহল্যা আর সে অহল্যা নেই। সেও যেন ছেড়ে দিয়েছে মহিমকে, বন্ধন যেন কেটে গেছে। আর সব সইলেও এ সইল না তার। মানুষ শুধু তার নিজের কথাই চিন্তা করে। মহিমও তাই। একবারও ভেবে দেখল না অহল্যার কথা। কেন সে তার কাছে আসেনি, এ দুর্জয় অভিমানেই অহল্যার উপর মনটা বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল তার। একবারও মনে হল না, অহল্যা জীবনের কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কী হারিয়ে কী নিয়ে বসে আছে।

উমা বলল, কি দেখছ মহিম?

মহিম তাকাল উমার দিকে। হ্যাঁ, আকুল আহ্বান রয়েছে ওই

চোখে, মিষ্টি ডাক রয়েছে ওই সুন্দর ঠোঁটে, উষ্ণ আলিঙ্গনের জন্ম অপেক্ষা করে আছে ওই সুগঠিত আধখোলা বুক।

সে বলল, যাব আপনার সাথে।

আচমকা উল্লাসে মহিমকে দু-হাতে বেষ্টন করে উমা মহিমের চোখে বুলিয়ে দিল তার ঠোঁট।

সমস্ত শরীর ঝিম ধরে রইল মহিমের। মদের নেশার মত চোখের পাতা বড় ভারী হয়ে গেল, জ্বলতে লাগল। মনে হল সমস্ত জগৎ যেন টলছে।

উমা বলল, আমাদের বাড়ীতে যার হাসির কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, তার কথা শুনবে না?

যেন জ্বরের ঘোরে মহিম বললে, বলেন।

উমা বলল, মহিলাটি আমার খুড়ি শাশুরী। বয়স কম। ওঁর স্বামী যখন মারা যায় তখন একটি ছেলে ওঁর বছর চারেকের। হঠাৎ ক-দিনের রোগে ছেলেটি মারা যায়। কিন্তু ওর ধারণা সম্পত্তির ওয়ারিশকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার শ্বশুর নাকি মেরে ফেলেছেন ওঁর ছেলেকে। সেই থেকে এরকম হয়ে গেছেন। ব্যাপারটা বাইরের লোকে অবশ্য জানে না। একটু হেসে বলল, তবে এসবই আমার বিয়ের আগে। তোমার বড় ভয় ওই হাসিতে, না?'

একদিন একথা শোনার খুবই আগ্রহ ছিল মহিমের। আজ সে কথা তার কানে গিয়েও গেল না। বিন্দুমাত্র কৌতূহল হল না।

উমার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে মহিম বলল, ভয় ছিল, আজ নাই।

উমা বলল, আমি এখন যাই। পরানকে ডাকতে পাঠাব, তুমি যেও। বলে মহিমের হাতে একটু চাপ দিয়ে উমা আজ বেরিয়ে এল

ছায়ামুক্ত মুখে। একবার দেখল বাড়ীটার চারদিকে, তারপর পরানের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল সে।

মহিম বেরিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে খালের মোহনার পথ ধরে ছুটল। উদার শূন্য আকাশের তল ছাড়া আর কিছু চায় না সে।

(২৩)

দুদিন কাটল এমনি। তৃতীয় দিন খালের মোহনার ধারে হঠাৎ মহিমের নজরে পড়ল, খালে ঢুকছে একটি শিশুর মৃতদেহ। শ্যামবর্ণ নিটোল নবজাত শিশু উবু হয়ে জলে ভাসছে। নরহরির সাহায্যে শিশুটিকে ডাঙায় তুলে খাল ধারে পুতে দিল মহিম।

তারপর কি বিচিত্র খেয়ালে বাড়ী এসে সেই শিশুর মূর্তি গড়তে শুরু করল সে। এমন কি, কুঁজো কানাইয়ের মূর্তি শেষ করার আগেই সেই মূর্তি গড়তে লাগল।

আজ আর মহিমকে দেখে কেউ সুস্থ বলতে পারবে না। আজকের তার নাওয়া খাওয়া ভোলার চেহারা অন্যরকম। যেন জ্বরের বিকারের ঘোরে কাজ করছে সে। কাজ থামিয়ে চেয়ে থাকে তো চেয়েই থাকে। ঘণ্টা কেটে যায়। তার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তার উদয় হতে লাগল। তার গড়া শিশুকে সে একবার ভাবল এ বুঝি হরেরামের বউয়ের বিয়োনো মরা ছেলে। আবার ভাবল এ হয়তো বনলতার অনাগত সন্তান। তারপর হঠাৎ তার মনে হল এই শিশু কেন অহল্যার গর্ভেও আসে না! মানুষ কোথা থেকে এল, কেন এল? ··· এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে হাজার চিন্তায় মাথায় যেন রক্ত উঠে আসে তার। ঘরটার মধ্যে প্রেতের মত পায়চারী করে সে। আচমকা ঠাণ্ডা মাটীতে বুক চেপে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে।

অহল্যা পাষাণ। সবই দেখছে, সবই শুনছে কিন্তু আড়াল ছেড়ে কখনোই বাইরে আসে না। ভরতের শেষ কথাগুলো কেবলি থেকে

থেকে তার মনে পড়ে। চমকে চমকে নিজের গা হাত-পা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মহিমকে দেখলেই চোখ নামিয়ে চকিতে আড়ালে সরে যায়। চোখ ভরা ত্রাস তার। গোপন কান্নার বদলে গোপন ভয় বুঝি বাসা বেঁধেছে তার বুকে। ভাত বেড়ে দিয়ে বসা দূরের কথা, দাঁড়ায় না পর্যন্ত। একি হল তার! ভরত বলেছিল, কাঁদবার ঢের সময় পাবি। কোথায় সেই কান্না! ... সে দেখল বৌঠাকুরানীকে আসতে, শুনল মহিমের চলে যাওয়ার বাসনার কথা। দেখেছে মহিমকে আলিঙ্গনাবদ্ধ বৌঠাকুরানীর বুকে। পাষাণের বুক অহল্যার, তবু কেন প্রাণের ধিকি ধিকি শব্দ শোনা যায়! নিশীথ রাত্রে বাড়ীর পেছনে ডোবার নিস্তরঙ্গ জল ডাক দিয়ে গেল, হাতছানি দিয়ে গেল নয়নপুরের খালের তীব্র স্রোত। খালের মোহনায় মধুমতী কোল ডাক দিল তাকে। কিন্তু ভেতরে দুটো মনের কোলাহলে নিঃসাড় রইল সে। ঘরের অন্ধ কোণে অশ্রুহীন চোখে হাত দিয়ে বসে রইল সে।... জীবনের এ দুর্বোধ্য বিপর্যয় কিসের?

শিশুর মূর্তি গড়ার দুদিন বাদে সন্ধ্যার খানিক পরে মহিম ফিরে এল মোহনার ধার থেকে। তেমনি জ্বর বিকারের ঘোর লেগে রয়েছে তার মুখে, চোখ লাল, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। চোয়াল শক্ত, ঠোঁট টেপা। সে সোজা এসে উঠল অহল্যার ঘরের দরজায়। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মহিম ডাকল, বউদি!

অহল্যা বসেছিল চুপচাপ ঘরের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, কি?

তোমারে একটা কথা বলতে আসছি।

অহল্যা নীরব। মহিম ও খানিকক্ষণ চুপ থেকে যেন নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বলল, মুই চলে যাব এখান থে।

বলতে তার গলায় যেন কি ঠেলে এল ভিতর থেকে। তাকে জোর করে রোধ করে বলল আবার, মুই কাঁটা হইছি তোমার, সরে যাওয়া মোর ভাল। মুই কাছে থাকলে তোমার যন্ত্রণা লাগে, তার শেষ হউক।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে অহল্যা বলল, কে কাঁটা হইছে ভগবান জানে তা। যেতে চাইলে আটকাবে কে তোমারে?

বিভ্রান্ত চোখ মহিমের হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল, কেউ আটকাবে না। মোর ঘরে একটু আসবে।

কেন?

কাম ছিল।

একটু চুপ থেকে অহল্যা বলল, চল যাচ্ছি।

মহিম চলে গেল নিজের ঘরে। অহল্যা প্রদীপ নিয়ে মহিমের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মহিম ডাকল, ভিতরে আস।

অহল্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিমকে দেখে ভিতরে এল।

মহিম শান্তভাবে বলল, বস না কেন?

কি করবে মহিম, কি চায়? অহল্যা চমকায়। প্রদীপ রেখে বসল সে।

মহিম সেই শিশুর মূর্তি অহল্যার কোলে রেখে দিয়ে বলল, তোমারে কভু কিছু দেই নাই, এটা দিলাম। মোরে ঠেলে দিলা, মোর হাতে গড়া একে কি ঠেলতে পারবে?

অহল্যা ফ্যাকাসে মুখে আর্তনাদ করে উঠল। দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল সে, একি করলা, একি করলা তুমি? এত নির্দয়, এত বড় শত্তুর হইলা তুমি মোর?

শত্তুর! কেন?

নয়? ' অহল্যা ডুক্‌রে উঠল। বলল, মোর যে কোন আশা নাই, সব যে শেষ হইয়া গেছে। হায়, তোমার দাদাও যে আর নাই।

কথা শুনে বুকটা পুড়ে গেল মহিমের। সে তো এসব কথা ভাবে নাই। সে যে রক্তক্ষয়ী অভিমান বশে তার শেষ দান ওই শিশুটি অহল্যাকে দিয়ে যেতে চেয়েছিল। যে বুক তাকে ত্যাগ করেছে, সে বুকে অহল্যার নিয়তি কামনার মূর্তি স্থান পাবে ভেবেছিল। ... সে দু-হাতে মুখ ঢেকে অপরাধীর মত ছুটে পালিয়ে গেল।

অহল্যার বুক ফাটল, চোখ ফেটে জল এল। বার বার একই কথা বলতে লাগল; একি করলা, একি করলা। তারপর মুখ তুলে দেখল মহিম নেই। বাতি জ্বলছে। তার চোখ পড়ল শিশুর দিকে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। একি দেখছে সে! কোলে তার নধর শ্যাম শিশু, অপলক মধুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নরম ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, কচি মাড়ি দেখা যাচ্ছে তার ভিতরে। সুগোল কচি কচি হাত বাড়ান অহল্যার দিকে। বুঝি ডাক শুনতে পেল শিশুর। আচমকা সন্তানহীনা অহল্যার স্তনযুগলের শিরাউপশিরা বড় ভারী হয়ে টনটন করে উঠল, স্ফীত হয়ে উটল স্তনের বোঁটা।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে বুকের কাপড় খুলে মাটীর ঠাণ্ডা শিশুকে আগুনের মত উষ্ণ বুকে চেপে ধরল সে। যেন প্রাণ সঞ্চার করবে মাটীর শিশুর মধ্যে। ... থাকতে থাকতে নিজেকে দেখার বাসনা তার উদগ্র হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র করে মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখতে লাগল সে। ... নিটোল পা, বিশাল উরত, প্রশস্ত নিতম্ব, জননীয় জঠর, বলিষ্ঠ বুক, সুডৌল হাত। বিস্মিত মুগ্ধ চোখে দু-হাতে স্তন তুলে দেখল সে। তারপর মাটীতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিরাম নেই সে কান্নায়।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে একসময় সে থামল। মাটীর শিশু মাটীতে রাখল, মহিমের মুখ মনে পড়ল তার। সে মুখ মনে করে উৎকণ্ঠায় বুক ভরে উঠল তার, হাহাকার করে উঠল প্রাণ। সেই অসহায় দিশেহারা যন্ত্রণাকাতর মুখ মনে করে অপরাধে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মহিমকে মেরে ফেলতে বসেছে সে! তার শৈশবের বন্ধু, অহল্যা-বউয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল মহিম! তাকে সে বিদেশে, বৌঠাকুরানীর অচেনা বুকের আগুনে ছুঁড়ে দিতে চাইছে দগ্ধে মরবার জন্য। কেন সে বুঝল না, মহিমের সারা প্রাণ ছড়ানো নয়নপুর, তার প্রিয়তম বন্ধুদের তিরোভাব, বীভৎস হত্যা, ভিটের শোকে ভাইয়ের মৃত্যু সব যখন তাকে দিশেহারা করে দিয়েছে সেই সময় অহল্যার সরে যাওয়া তার মাথায় মৃত্যু-আঘাত করেছে। সে তো জানত, এ জীবনে নিজের কথা ভেবে কোন লাভ নেই। তবু নিজেকে নিয়েই সে কেন পড়েছিল?

ত্রস্তে কাপড় সামলে বাতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সে দরজা খুলল। ডাকল, ঠাকুরপো!

নিস্তব্ধ অন্ধকার উঠোন থেকে মানুষ দেখে শেয়াল পালিয়ে গেল। সেখানে কেউ নেই। ভয়ে কান্না পেল অহল্যার। ডাকল, মহী, মহী!

সাড়া নেই। সব নিস্তব্ধ। গাছের আঁধার কোল থেকে রাতজাগা পাখী ডাকে। অহল্যা ছুটে নিজের ঘরে গেল। ঘর খালি। রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর সব শূন্য। হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ীর পিছনে পিপুলতলায় মাটীতে বুক চেপে মহিম শুয়ে আছে। বুকটা পুড়ে গেল অহল্যার। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দু-হাতে মহিমের মাথাটা তুলে ধরে ডাকল, মহী, মহী, ওঠ!

মহী, মহী, ওঠ।

মহিম মাথা তুলে চোখ মেলে তাকাল। রক্তবর্ণ চোখ, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। বলল, আজ নয়, কাল চলে যাব।

কান্না চেপে অসম্ভব শক্তিতে অহল্যা মহিমকে টেনে তুলল। বলল, কোথায় যাবে এখান ছেড়ে? কোথাও যেতে পারবে না। ওঠো পীপ্‌গির মাটী ছেড়ে!

স্থির চোখে মহিম তাকাল অহল্যার দিকে, চোখের ঘোর যেন কাটতে লাগল।

মহিমের মুখভাব দেখে কান্না ঠেলে এল অহল্যার। বলল, মোর বুঝি খিদে তেষ্টা নাই। ওঠো, খাবে চল।

এবার মহিম অহল্যার কোলে মুখ রেখে সেই শিশুর মত ফুলে ফুলে উঠল কান্নায়। সে কান্নায় অহল্যার কান্না এল।

(২৪)

পরদিন ভোরবেলা দীনেশ সাস্থালের খ্যাকারিতে মহিমের ঘুম ভেঙে গেল। কইরে মণ্ডলের পো, আছিস্ টাছিস্, না, ভাগলি?

নিশ্চিত ঘুমে মহিমের মুখ আজ বেশ প্রফুল্ল। এক রাত্রে যেন তার অনেকদিনের সমস্ত ক্লেদ কেটে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, নমস্কার সানেল মশাই।

সাস্থাল বলল, কি রে, আদালতে কিছু জমা টমা তো দিলিনে। ভেবে দেখলি কিছু?

মহিম বলল, ভাবার তো কোন উপায় নাই সানেল মশাই।

হুঁ! সাস্থাল একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, উপায় আছে বই-কি। কত্তার কথাটা ভেবে ছাখ্। তাতে সবই বজায় থাকবে।

মহিম বলল, জমিদারের ঘরে চাকরি মুই নিব না। নিজের মন ছাড়া মুই গড়তে পারব না কিছু।

সাস্থাল হেসে বলল, তুই ব্যাটাদের মনও তো সেরকম। অথচে চাষার ঘোষ, ভাগচাষায় ওরা মুখ। এ ছাড়া কি দুনিয়ায় কিছু নাই?

সকালবেলাই মহিম আর বাকবিতণ্ডা বাড়াতে চাইল না। বলল, সে আপনি বোঝবেন না সানেল মশাই। আপনি এখন যান, মোর কাজ আছে।

সাস্থাল বক্র ঠোঁটে চোখ কুঁচকে বলল, এখনও কাজ? জেদ এখনও? ভাল, ভাল। কর্তা পাঠিয়েছিল তাই বললাম। তবে এক কাজ কর্। আমের আঁটির ভেঁপু কিছু তুলে রাখ্। বলে হো হো করে হাসতে হাসতে

বেরিয়ে গেল। অহল্যা গোবর জলের বালতি হাতে সবই শুনল। বাপ ভাইয়ের কথাই মনে পড়ল তার। এ মধ্যে কয়েকদিন তার বাবা পীতাম্বর আর দাদা ভজন এসে ঘুরে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে কোন গতি আছে কি না কিছু বিক্রি বাটা করে ভিটে বজায় রাখবার। অহল্যা তাকে সবই বলেছে যে, কিছুই নেই। পীতাম্বর মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অহল্যা কিছু বলতে পারেনি। বাপ জিজ্ঞেস করেছে, তোর দেওরের জন্ম ভাবছিস্? সে কথার জবাবও অহল্যা দিতে পারেনি। পীতাম্বর দেখেছে মেয়ে তার বড় রাসভারী। তবু একটু চুপ করে থেকে বলেলে, চাষ করে খাই সত্য, মোরা কাউকে দয়া ধম্মো দেখাতে পারি না। কিন্তুক্ তোর দেওরের মত কীর্তিমান ছেলে যদি মোর ঘরে দু-দিন থাকে তবে বর্তে যাই। ভিটে তো আর আটকে থাকবে না। ভজন বলেছে, ওর ভিটা নাই কিন্তুক নয়নপুরের অনেক ভিটার দোর ওর জন্ম খোলা রইছে। আর শুধু নয়নপুরই বা বলি কেন। এ তল্লাটে কোথায় নাই? ব্যাপারটা এমনই যেন, অহল্যাকে রাজী করানোটাই বাপ-ভাইয়ের কাছে সবচেয়ে বড়। তাই পীতাম্বর বলেছে, মোরা গতর খাটাই, মহিম গতরও খাটায়, চিন্তাও করে। এ দুটো ছাড়া মানুষের আর কি কাজ থাকতে পারে মুই জানি না।

অহল্যা অরাজী হয়নি কিন্তু কিছু বলতেও পারেনি। বুক তখন তার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে। সান্ন্যালের ঘুরে যাওয়ার পর ভবিষ্যৎ চিন্তাতে ডুবে গেল সে।

মহিম তখন নতুন উদ্যমে শুরু করেছে আধ শেষ কুঁজো কানাইয়ের মুরতি।

দুপুরে এল পরান। পরান আজকাল খুবই বিমর্ষ, নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। এসে ডাকল মহিমকে।

মহিম বেরিয়ে এসে বলল, পরানদা বৌঠাকুরানীরে ব'লো, নয়নপুর ছেড়ে মুই যাব না।

সেদিনের ক্রুদ্ধ বাঘিনী অহল্যা আজ শান্তভাবে এসে বলল, বৌঠাকুরানীরে ব'লো পরানদা, তানৃ়া হলেন রাজরাজড়া লোক, দরিদ্র মহিমের পরানটুকু নিয়ে তার পরান কতটুকু ভরবে? ওর পথ ও-ই দেখে নেবে।

পরানের বিস্মিত মুখে মিট মিট করে উঠল হাসি। দু পা এগিয়ে এসে অহল্যাকে বলল, তাই তো ভাবছিলাম যে, তেলজলে এমন মিশ খায় কেমন করে। আচ্ছা, তাই বলব।

বকে পরান বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেমন বিমর্ষভাবে এসেছিল তার চেয়ে অনেকটা খুশি নিয়ে যেন ফিরল সে।

(২৫)

পরদিন বেলা প্রায় একটা।

অহল্যা ডোবায় গেছে বাসন মাজতে। মহিম নানান্ রকম গাছের আঁটা ও চূর্ণ সংমিশ্রণে মাটী দিয়ে মূর্তি গড়ার নতুন মশলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

এমন সময় জমিদারের কয়েকজন পাইক, আদালতের নাজির, পেয়াদা এসে হাজির হল। পেছনে সান্তাল বোধ হয়, দখলদারের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছে।

পেয়াদা হাঁকল, মহিম মণ্ডল, ঈশ্বর ভরত মণ্ডলের বউ অহল্যা মণ্ডল বাড়ীতে আছে?

মহিম উঠোনে নেমে এল। বলল, কি বলছেন?

নাজির বলল, তুমি ভরত মণ্ডলের ভাই মহিম মণ্ডল?

হ্যাঁ।

নোটিশ পেয়েছিলে তুমি গতকাল রাত্রের মধ্যে ভিটে ঘর সব খালাস করে দেওয়ার?

না তো!

পেয়াদা খিঁচিয়ে উঠল, কোথায় ছিলা বাবা। বড় ভাই জীবনভর মামলা করে ম'ল, এখবরটা রাখ না?

নাজির গম্ভীর গলায় বলল, দশ মিনিট সময় দেওয়া গেল। যা পার, খালাস কর?

ডোবার ধার থেকে অহল্যা ছুটে এসে ঘোমটার আড়াল থেকে

বলল ; ঘরের মানুষ বলছিল, তিন মাস সময় আছে। সে সময় তো হয় নাই ?

সান্যাল তাকাল নাজিরের দিকে, নাজির তাকাল পেয়াদার দিকে। পেয়াদা হেসে উঠল হাতের কাগজগুলো অহল্যাকে দেখিয়ে তোমার মানুষ মরবার সময় কি বলছিল তা জানি না আর আদালতের কাগজ তোমার বাওড়ঘাটের মেয়েমানুষের ঘোঁট পাচালীও নয়। দুই মাস বাইশ দিন গত কাল পূর্ণ হয়ে গেছে। এই হল আদালতের রায়।

সান্যাল বলল, যা করতে হয় করেন নাজির মশাই। বলে সে পেয়াদাকে প্রথম দেখাল মহিমের ঘর।

পেয়াদা পাইকদের নিয়ে মহিমের ঘরের দাওয়ায় উঠে বলল, খালাস কর এ ঘর।

যেমনি বলা, তেমনি পাইকদের সঙ্গে পেয়াদা ওঘর থেকে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলতে শুরু করল।

মহিমের প্রাণ, মহিমের রক্ত দিয়ে গড়া সব মূর্তি উঠোনে এসে পড়তে লাগল। বিচূর্ণ হতে লাগল সব।

প্রথমটা মহিম হতভম্ব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন চক্ষের নিমেষে কি ঘটে গেল। পরমুহূর্তেই আকাশফাটানো চীৎকার করে সে ছুটে গেল ঘরের দিকে। কিন্তু অহল্যা ছুটে এসে মহিমকে দুই হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। বলল, ঠাণ্ডা হও মহী। ওরা এখন শোধ তুলছে, ওরা যে হার মানছে তোমার কাছে। জিততে পারে নাই।

কুঁজো কানাইয়ের অর্ধসমাপ্ত মূর্তির গলা ভেঙে গেছে, হরেরামের মুখ চূর্ণবিচূর্ণ, পাগলাঠাকুরের মূর্তি, শিবসতী, বুদ্ধদেব, কিছুই ভাঙতে বাদ গেল না। পুরনো দিনের সব কাজ, ভাঙাচোরা অবস্থায় উঠোনে স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। অহল্যার মাটির শিশু টুকরো টুকরো হল।

ভূমিকম্পে উৎক্ষিপ্ত বিশাল মাটির চাঙরের মত অখিল আর তার ঘোষের মূর্তি আছড়ে পড়ে খান খান হয়ে গেল।

যারা দেখতে এসে ভিড় করেছে তারা ডুকরে উঠল। অহল্যা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। তার হাতে ধরা মহিম চোয়াল শক্ত করে প্রতিটি মূর্তিকে ধ্বংস হতে দেখল, রুদ্ধশ্বাস, অপলক কঠিন দৃষ্টি, যেন পাথর হয়েছে।

হরেরামের বাউরী বউয়ের কান্না শোনা গেল। সে কান্নায় নয়নপুরের বাতাস হল বাউরী। আকাশে মেঘ ভেসে গেল হরেরামের বীভৎস মুখের আকৃতি নিয়ে। বাঁশঝাড়ের বাউরী হাওয়া তেপান্তর দিয়ে খাল বেয়ে নদী ভেঙে ছুটে গেল দিগদিগন্তে।

ধ্বংসের স্তূপ মাঝে ঝাপসা হয়ে গেল মহিমের চোখে। তার চোখে ভেসে উঠল কুঁজো কানাইয়ের মুখ। কালুমালার 'সোন্দরী মেইয়ের' মুখ দেখতে গিয়ে যে অপঘাতে মরেছে। তার চোখে ভাসল অখিলের সেই কান্নার কথা, মৃত ঘোষের নিষ্পলক চোখ, না দেখা ভাদ্রবউয়ের অনুরাগ ভরা মুখ, হরেরামের ভ্রূকুটি, বউয়ের বিয়োনো মরা ছেলে। তার চোখে ফুটে উঠল গোবিন্দর মন্ত্রগুরু, তার প্রাণবন্ধু পাগলাঠাকুরের উদ্দীপ্ত মুখ, দেশে বিদেশে আবাদে জঙ্গলে যাকে খেয়ে না খেয়ে শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। সে দেখল নয়নপুরের খালের শ্যাম শিশু হাসতে হাসতে নয়নপুরের তেপান্তর ভেঙে ছুটে আসছে। হরেরামের বউয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, অহল্যার কোল জুড়ে এসে বসেছে। আহা, সংসারে যেন হাসি ফোটাবার মানুষ আসছে! ...

চোখের জল সে কিছুতেই রোধ করতে পারল না।

পীতাম্বর আর ভজন এসে অহল্যা মহিমকে ধরে ডাকল, চল, বেলা যায়।

সারা নয়নপুরের মানুষ এসেছে এ ধ্বংসলীলা দেখতে। গোবিন্দ এসে দাঁড়িয়েছে মহিমের হাত ধরে। বনলতা এসেছে পাশে।

মহিমের শিল্প-সাধনায় অতীত দিন আর ভরতের প্রাণভরা ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার রিক্ত সংসারের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে তারা সকলে বেরিয়ে এল।

হরেরামের বাউরী বউয়ের কান্না বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়ছে সারা নয়নপুরে। সারবন্দী মেঘের দল ছুটে চলেছে উত্তর দিকে। হেলে পড়া সূর্যের আলো পড়ে সেই মেঘের ধারে ধারে যেন আদিম কালের পাথরের কিম্ভূতকিমাকার অস্ত্রের মত দেখাচ্ছে।

অহল্যা পেছিয়ে পড়েছে। ভজন-পীতাম্বরের সঙ্গে চলেছে মহিম। তাদের পেছনে চলেছে অনেক মানুষ, যেন ক্রোধে বেদনায় আত্মহারা মূক মিছিল একটা।

সকলের অলক্ষ্যে জমিদারবাড়ীর দোতলায় একটি ছোট জানলা খুলে গেল। দেখা গেল উমার মুখ। তার মুখে হাসি নেই, বেদনা নেই, রাগ নেই, যেন ত্রাস রয়েছে। কেন, তা সে-ই জানে।

পাগলীর সেই হাসি অন্তঃপুরের অলিন্দে অলিন্দে খিলানে প্রাচীরে ঘা খেয়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে ইমারতের অন্ধ গুহায়, তলিয়ে যাচ্ছে সন্তান-সন্ধানে।

খানিকদূর চলে ভজন আর পীতাম্বর হঠাৎ দাঁড়াল। বলল, অহল্যা যে পেছিয়ে পড়ল।

মহিম দেখল পথের মাঝে ভিটের দিকে ফিরে অহল্যা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, মুই নিয়া আসি।

মহিম এসে দেখল, পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে অহল্যা দাঁড়িয়ে আছে ছেড়ে আসা ভিটা, উঠানের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে।

নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, বিশাল বলিষ্ঠ বুক সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মত ভুলে উঠছে। চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। আগুন ভরা চোখ। ঘোমটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে, অবিন্যস্ত চুলের গোছা এসে পড়েছে মুখে। ঠোঁট কঠিন রেখায় বঙ্কিম।

তারপরই আচমক. মনে পড়ল ভরতকে। জীবন্তে, মরণেও যার জন্ম হৃদয়ে ওার এতখানি অনুশোচনা বুঝি হয়নি, এখন হল যেন তার সব চিহ্ন আজ ছেড়ে যাবার বেলায়।

মহিমের চোখে আলো ভরে উঠল। আবেগ কম্পিত গলায় বলল, বউদি, তোমার মূর্তিখানি মুই গড়ব, এই মুখ, এই চোখ মুই গড়ব। নতুন প্রন্থে সেই হইবে মোর প্রথম কাজ। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অহল্যা মহিমের দিকে তাকাল। ভাবে আবেগে গভীর চোখ মহিমের। অহল্যার বুক ঠেলে হঠাৎ কান্না এল। ফিস্ ফিস্ করে বলল, চেরকাল মুই পাথরের অহল্যা হইয়ে থাকব?

মহিম বলল, না, তাতে মুই-পরান পিতিষ্ঠা করব!

চকিতে মুখ ফিরিয়ে অহল্যা বলল, নেও, সে হইবে অখন। বলে ঘোমটা টেনে দিল। যেন ভয় পেয়েছে। পীতাম্বর হাঁক দিল একটা। মহিম এগিয়ে চলল।

কিন্তু অহল্যা কান্না কিছুতেই রোধ করতে পারল না। মুখে আঁচল চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। এ গোপন কান্নার বুঝি শেষ নেই।

আহা, বাঁধা বীণার তারে বেসুর কি গভীর!